বিপ্লবী রাসবিহারী বসু

প্রথমে দেশের স্বার্থ, পরে অন্য কিছু।
আমি এক যোদ্ধা ছিলাম।

—রাসবিহারী বসু

BIPLABI RASH BEHARI BASU

A Bengali Biography of Rash Behari Basu

By : Moni Bagchee

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৪৬

শিল্পী : সুমুখ মিত্র

প্রকাশক : শ্রীভবেশচন্দ্র বিশ্বাস
শিক্ষা-ভারতী
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক
রুবী প্রিন্টিং হাউস
৪০/১ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২



শিক্ষা-ভারতী

৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

রাসবিহারী বসুর ৮১তম জন্মদিবসে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়
প্রকাশিত লেখকের একখানি পত্র।

RASH BEHARI BOSE

Sir,—It is unfortunate that no adequate steps have been taken either by the public or the Government to perpetuate the memory of the great freedom fighter, Rash Behari Bose, whose 81st birthday anniversary will be observed today. (May 25). His contributions towards the cause of India's independence are well known and Netaji Subhas Chandra Bose himself, while paying tribute to Rash Behari Bose when the latter died in 1945 at Tokyo, observed : "The late Rash Behari Bose was not only a born revolutionary but also a great man. It may be truly said of him that he lived and died for India's freedom."

It is time that we reassessed the historical significance of Rash Behari Bose's activities outside India which culminated in the establishment of the Indian Independence League, which paved the way for the INA under the leadership of Netaji. We must acknowledge the impact of both the League and the INA on the final phase of India's struggle for independence. Thus Rash Behari Bose was a key-figure in the history of India's freedom movement.

Though twenty years have passed since his death there is still no biography of Rash Behari Bose in Bengali although there is one in Japanese written by a Japanese. Neither have steps been taken to translate into Bengali the books he wrote in Japanese. Suitable memorials to him should be erected both in Calcutta and Delhi and arrangements made to bring his ashes back to India from Tokyo.—Yours, etc. MONI BAGCHEE.

Calcutta-28, May 23

রাসবিহারী বসুর সহধর্মিণী

শ্রীমতী তোসিকো বসুর

পুণ্য স্মৃতিতে।

॥ জাপানের চারু চেরীফুল তুমি, বাংলার রাঙাজবা ॥

এই লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ :

গৌতম বুদ্ধ, রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, রমেশচন্দ্র, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রবির আলো, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, শিক্ষাগুরু আশুতোষ, নিবেদিতা, নিবেদিতা-নৈবেদ্য, লোকমাতা নিবেদিতা, সুধীরকুমার সেন, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার, জননায়ক জওহরলাল, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ, সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক, সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী, মহাচীনে শ্রীনেহরু, অমর জীবন, আমাদের বিদ্যাসাগর, নানাসাহেব, কেমন করে স্বাধীন হলাম, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, সিপাহী বিদ্রোহ, বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, লীলা-কঙ্ক, কাজলরেখা, ছোটদের ছত্রপতি, ছোটদের বার্ণার্ড শ, ছোটদের বিবেকানন্দ, ছোটদের অরবিন্দ, ছোটদের গৌতমবুদ্ধ, ছোটদের বঙ্কিমচন্দ্র, ছাত্রদের আশুতোষ, SISTER-NIVEDITA GAUTAM BUDDHA

সম্পাদিত গ্রন্থ :

মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য ও পলাশির যুদ্ধ

পরবর্তী গ্রন্থ :

জীবনীশতক, বীর সাভারকার, SWAMI ABHEDANANDA

॥ ভূমিকা ॥

পরাধীনতার গ্লানি যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সকল দেশেই দেশ-প্রেমের অভিব্যক্তি নানা পথে হইয়া থাকে। এই অভিব্যক্তির তুইটি ধারা—একটি বৈধ বা নিয়মানুগ আন্দোলন আর অপরটি হইল সন্ত্রাসবাদ কিম্বা সশস্ত্র বিপ্লববাদ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তুই দশক হইতে আমরা ভারতবর্ষেব মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই তুইটি ধারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইতিহাসের বিচাবে তুইটিরই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য। আমি চিরকাল সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। কৈশোর হইতে এই পথেই আমার প্রথম পদক্ষেপ ঘটিয়াছিল। এই শতকের সূচনা হইতে বাংলা দেশে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহার সহিত একজন কর্মী হিসাবে সংযুক্ত থাকিবার সুযোগ আমার জীবনে ঘটিয়াছিল।

সেই সময়ে যেসব বিপ্লবীনেতাব সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('বাঘা যতীন') ও রাসবিহারী বসু—এই তুইজনের স্মৃতি আমার চিত্তপটে আজিও উজ্জ্বল রহিয়াছে। ইঁহাদের তুইজনেরই জীবন যেন গীতার সুরে সাধা ছিল, তুইজনেই যেন বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মানস-সন্তান ছিলেন। তুইজনেই কবি হেমচন্দ্রের "তূণীর কৃপাণে কররে পূজা"—এই উক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে ইঁহাদেব তুলনা হয় না। সেই শক্তির দাপটে প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সরকারকে টলটলায়মান হইতে দেখিয়াছি। নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ ছিলেন এই তুইজন বিপ্লবী মহানায়ক। বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিবাব মতো শক্তি ইঁহাদের বাহুতে ও মস্তিষ্কে ছিল। অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে যতীন্দ্রনাথের আত্মদানে বালেশ্বরের বুড়িবলঙ্গের তীরে নব ভারতের হলদিঘাট সৃষ্টি হইয়াছে আর একুশ বৎসর পূর্বে টোকিওতে রাসবিহারীর মৃত্যুতে বিপ্লবের একটি গৌরবময় অধ্যায়

শেষ হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারীর জীবন যেন পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের (Supreme self-dedication) জীবন। তবে রাসবিহারীকে শুধু একজন বিপ্লবী নায়ক মনে করিলে ভুল হইবে। তিনি ছিলেন একটি বড় রকমের political genius বা রাজনৈতিক প্রতিভা যাহা বিপ্লবীদের মধ্যে সচরাচর দুর্লভ। ভারতের বিপ্লবীসমাজে তাঁহার একটি অনন্যলব্ধ স্থান আছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাসবিহারী সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য জীবনেতিহাস প্রণয়নে আমরা দীর্ঘকাল অবহেলা করিয়াছি। যতীন্দ্রনাথের পৌত্র, শ্রীমান পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতামহের জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে তথা বাংলা দেশে রাসবিহারী সম্পর্কে এপর্যন্ত যতটুকু করা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব 'বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু স্মারক সমিতি'র প্রাপ্য। আমি স্বয়ং কিছুকাল এই সমিতির সভাপতি ছিলাম। এই সমিতির উদ্যোগে তিন বৎসর পূর্বে শ্রীরাধানাথ রথ ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *Rash Behari Basu, His Struggle for India's Independence* নামে ইংরেজীতে যে স্মারকগ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ জীবনচরিত না হইলেও, রাসবিহারীর জীবন সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতের একাধিক ভাষায় তাঁহার সম্পর্কে জীবনীমূলক কয়েকখানি পুস্তিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। জাপানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানে রাসবিহারীর কত সমাদর ; জাপানী ভাষায় তাঁহার সম্পর্কে একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত বহুপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত তাঁহার কোনো জীবনবৃত্ত রচিত হয় নাই। ইহা সত্যিই পরিতাপের বিষয়।

এমন সময়ে একদিন আমার পরম স্নেহাস্পদ, খ্যাতনামা জীবনীকার শ্রীযুত মণি বাগচি একখানি পাণ্ডুলিপি আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। দেখিয়া আনন্দ হইল যে, বাংলাভাষায় তিনি রাসবিহারীর একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন। সেই পাণ্ডুলিপিখানি পাঠ করিয়া বিষয়বস্তুর সহিত লেখকের একাত্মতা লক্ষ্য করিলাম। বুঝিলাম তিনি এই বিপ্লবী মহানায়কের জীবনবৃত্তকে যথার্থ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আধুনিক জীবনচরিত রচনার মূলসূত্রকে অনুসরণ করিয়া ইহা যে একটি বাস্তবধর্মী ও প্রামাণ্য জীবনী হইয়াছে তাহা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এতবড় একজন বিপ্লবী পুরুষের জীবনকাহিনী প্রণয়ন সত্যিই

কঠিন, কারণ ঐ জীবনের সম্যক উপলব্ধি ব্যতিরেকে এই কার্যে সফলতা লাভ অসম্ভব। গ্রন্থকার সেইদিক দিয়াও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতবোধ, এবং চিন্তা ও কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয়। লেখকের বহু পরিশ্রম ও চিন্তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। আর সেই সঙ্গে আছে তাঁহার হৃদয়ের সুতীব্র অনুভূতি।

আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আজ যে শোচনীয় অবক্ষয় দেখিতেছি তাহাতে আমার বিশ্বাস এই জাতীয় গ্রন্থের পঠন-পাঠন যত প্রসার লাভ করে, দেশের ও জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।

ভূপতি মজুমদার

বিপ্লবী বাংলার হৃদয়ের ছবি রাসবিহারী বসু।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে অহিংসা ও আপোষের দ্বারা, এই কথাই আমরা আজ জানি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ হয়ত এই ইতিহাসই শিখবে। কিন্তু পশ্চাতের ইতিহাস বিস্মৃত হলে চলবে না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেসব মহাপ্রাণ ত্যাগের হোমানলে সব কিছু আহুতি দিয়ে গেছেন, রাসবিহারী বসু ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। আত্মত্যাগে ভাস্বর তাঁর জীবনকে দেখতে হবে মূলত বাংলা তথা ভারতের অগ্নিযুগের প্রেক্ষাপটে। তাঁর জীবনের একটিমাত্র সঙ্কল্প ছিল—ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে বিতাড়িত করা, সমূলে উচ্ছেদ করা। তিনি তাঁর সেই সঙ্কল্প চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন।

এই গ্রন্থে আমি রাসবিহারী বসুর জীবনবৃত্তের সঙ্গে তাঁর কর্মধারার অনুসরণ করেছি ও তাঁর মানসবিকাশের কিছু আলোচনাও করার প্রয়াস পেয়েছি। আত্মবিস্মৃত বাঙালীর হাতে তাদের অতীত গৌরব তুলে দিলাম, ভবিষ্যতের নূতন সূর্যোদয়ের আশায়। প্রবীণ বিপ্লবী, আমার শ্রদ্ধেয় ভূপতিদা' এই বইয়ের একটি ভূমিকা লিখেছেন। আমি তাঁর স্নেহের পাত্র, সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিরত রইলাম।

মণি বাগচি



রাজা পি. এন. টেগোররূপী রাসবিহারী

(বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু স্মারক সমিতির সৌজন্যে)



পরিণত বয়সে রাসবিহারী

এক

১৯১২। ২৫শে ডিসেম্বর।

দিল্লীর চাঁদনী চক।

এই পথ দিয়ে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে চলেছেন। ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লীতে তিনি আজ রাজকীয় মহিমায় সরকারী ভাবে প্রবেশ করবেন। এতকাল অর্থাৎ এই দেশে যেদিন থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল শুরু হয় তখন থেকে ভারতের রাজধানী ছিল কলিকাতা। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পর মুখ্যত বাঙালীর প্রাধান্য খর্ব করবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে সরিয়ে নেওয়া হয়। লর্ড কার্জনের বিধানে এক বাংলা ভেঙে দুই টুকরো করা হয়েছিল। এই নিয়ে দেশব্যাপী যে আন্দোলন হয় ইতিহাসে তারই নাম বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। পরে ইংরেজ সরকার তাঁদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন এবং ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বঙ্গ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। এর এক বছর পরে দিল্লীতে নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। সেই উপলক্ষে লর্ড হার্ডিঞ্জকে একটি সুসজ্জিত হাতীর পিঠে বসিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। চাঁদনী চকে শোভাযাত্রাটি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড হার্ডিঞ্জের হাতীর উপর একটা বোমা পড়ল। তুমুল শব্দে বোমাটা ফাটতেই চারদিকের জনতার মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়। এ কী কাণ্ড! রাজপ্রতিনিধির উপর বোমা ফেলা! এতবড়ো দুঃসাহস কা'র? বোমাটা কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হাতীর মাহুতের উপর পড়েছিল এবং মাহুতটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। লর্ড হার্ডিঞ্জ সামান্য আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান।

এই বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এক দুঃসাহসিক বাঙালী যুবকের নির্দেশে ও নেতৃত্বে। এই যুবকের নাম রাসবিহারী বসু। বাংলা তথা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। এঁরই জীবনকথা আজ আমরা আলোচনা করব।

রাসবিহারী বসুর জীবনের প্রেক্ষাপটে যে বিক্ষুব্ধ কাল ও পরিবেশ রয়েছে, তাঁর জীবনের কাহিনী বলবার আগে সেই কাল ও পরিবেশের কথা কিছু উল্লেখ করতে হয়। সেই বিক্ষুব্ধ কাল ও পরিবেশের গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছিল বাংলার অগ্নিযুগ। সেই বিখ্যাত অগ্নিযুগ। এই অগ্নিযুগের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত না হলে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা করতে পারব না। এই শতকের গোড়ায় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে আশ্রয় করে বাংলায় এক অভিনব আলোড়নের সৃষ্টি হয়—সেই আলোড়নের পরিণতিরূপেই দেখা দিয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লব।

সেই বঙ্গ-ভঙ্গের ইতিহাসটা সংক্ষেপে এই রকম। উনিশ শতক শেষ হবার এক বছর আগেই ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। ইনি অত্যন্ত দাম্ভিক লোক ছিলেন এবং জাঁকজমক খুব ভালবাসতেন। ১৯০৩ সনের প্রথমেই তিনি মহাসমারোহে দিল্লীতে একটা দরবার করেন। জাঁকজমকপূর্ণ এই দরবারের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হলো। গরীব দেশের টাকা এইভাবে অপব্যয় হলো দেখে অনেকেই বিক্ষুব্ধ হলেন। আসলে এটা ছিল কার্জনের একটা মস্ত বড়ো ধাপ্পা। ঐ বছরের শেষভাগে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। ঐ বছরেই মাদ্রাজ-কংগ্রেসের সভাপতি লাল-মোহন ঘোষ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলেন। লর্ড কার্জন প্রতিবাদ শুনবার মতো লোক ছিলেন না।

উদ্ধতপ্রকৃতির রাজপ্রতিনিধি কার্জন ভারতবর্ষের মানচিত্রটা বদলে

দিতে মনস্থ করলেন। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বাংলার উপর, বাঙালীর উপর। শিক্ষায়-দীক্ষায়, কালচারে বাঙালী উন্নত—এটা তাঁর কাছে সহ্য হলো না। বাঙালী নেতা সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি দেশের মধ্যে তীব্র জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেছেন—এটাও তাঁর কাছে অসহ্য মনে হলো। বাংলা ভেঙে যদি দুই টুকরো করে দেওয়া যায়, তা'হলে বাঙালীর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যেতে পারে—এই মনে করে তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব তুললেন ও বিলাতের পার্লামেণ্টে ঐ প্রস্তাব যাতে কার্যকরী করা হয় তার জন্য সুপারিশ করে পাঠালেন। তিনি প্রস্তাব করলেন: বাংলা থেকে সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগ বিচ্ছিন্ন করে উক্ত বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডটি এবং ঢাকা ও মৈমনসিংহ এই দুটি জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আসলে তাঁর লক্ষ্য ছিল বাঙালীর নব-উন্মেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করা। কিন্তু ইতিহাসের এমনই বিচিত্র বিধান যে, কার্জন বিপরীতে হিত করলেন, অর্থাৎ জাতীয়তা-বোধকে ধ্বংস করতে গিয়ে তিনি একে যেন তীব্র করে তুললেন। জাতীয়তার দীপ আরো বেশি করে জ্বলে উঠল। এই কার্জনী-বিধানের পথ দিয়েই এক নূতন ভাবের প্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে চলল।

১৯০৩, ৩রা ডিসেম্বর।

লর্ড কার্জনের হাত থেকে নেমে এলো বঙ্গচ্ছেদের উদ্ধত খড়্গাঘাত। এইসময়ে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব গভর্নমেণ্ট প্রথম উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাব কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে দেবতার আশীর্বাদের মতো কাজ করেছিল—কার্জনের এই কঠিন আঘাতেই সেদিন জেগে উঠেছিল বাংলা, জেগে উঠেছিল সারা ভারতবর্ষ। সমস্ত বাংলা দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং অজস্র সভা-সমিতির ভিতর দিয়ে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ১৯০৫ সনের ২০শে জুলাই বিলাত থেকে সংবাদ এলো যে ভারত-সচিব

বঙ্গ-বিভাগ মঞ্জুর করেছেন। সংবাদটি আচমকা ঝড়ের মতো এসে পড়ল। আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে উঠল।

১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর। ঐ দিন বঙ্গ-বিভাগ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হলো। সারা বাংলা দেশ উঠল ক্ষেপে। দাঁড়াল তার বিপক্ষে সমস্ত শক্তি নিয়ে। চারদিকে জ্বলে উঠল বিক্ষোভের আগুন, জেগে উঠল বাংলার প্রাণ, বাঙালীর দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ। কার্জন যেমন সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে দম্ভভরে ঘোষণা করেছিলেন— "Bengal Partition Act is a settled fact.", ঠিক তেমনি স্পর্ধিত কণ্ঠে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ (তিনি তখন সারা বাংলার মুকুটহীন রাজা বলে গণ্য হয়েছিলেন।) ঘোষণা করলেন: "I shall unsettle the settled fact."—এ শুধু তাঁর মুখের কথা ছিল না, এ ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটি জাতির অন্তরের কথা।

জেগে উঠল বাংলা, জেগে উঠল ভারতবর্ষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' আর স্বামী বিবেকানন্দের 'অভীঃ'মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে বাঙালী দুর্জয় পণ করল—বঙ্গ-ভঙ্গ তারা রদ করবেই। ১৬ই অক্টোবর, (৩০শে আশ্বিন, ১৩১২) বঙ্গ-ভঙ্গের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জাতিব চারণকবি রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন প্রচলিত করলেন এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করে:

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।

বাংলার নগরে নগরেই শুধু নয়, গ্রামে গ্রামান্তরে, সর্বত্র এই রাখীবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। এইদিন বাংলাদেশের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে বাঙালীরা একে অপরের হাতে দুই বাংলার মিলনের প্রতীক রাখী বেঁধে দিয়ে শপথ করল: তাঁরা এক হবেন, ঘরের থাকতে পরের নেবেন না, পরের দুয়ারে ভিক্ষা মাগবেন না। বিলিতি জিনিস, বিলিতি কাপড় স্পর্শ করবেন না।

সেই উনিশ শো পাঁচের সকালবেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠে বাঙালী যেন নূতন করে শুনতে পেলো বিবেকানন্দের সেই প্রাণবাণী : "তোমার দেবতা আজ চায় তোমার জীবন-বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা সে তোমার জননী জন্মভূমি।" শুনতে পেলো বঙ্কিমচন্দ্রের সেই চিত্ত-স্পন্দী বাণী : "এই জন্মভূমিই আমাদের মা, আমরা অন্য মা জানি না, মানি না।" যে দেবীমূর্তির বিগ্রহ তিনি তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন কমলাকান্তের প্রাণের বেদীতে, উনিশ শো পাঁচে বাঙালী চেয়ে দেখল বিশ্বজননী আজ দেশজননীরূপে তাদের অন্তর আলো করে রয়েছেন। সেই উনিশ শো পাঁচের প্রত্যূষে বাঙালীর কানে এলো এক নূতন চেতন মন্ত্র—যে মন্ত্র এতদিন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের মধ্যে। উষার নবারুণ আলোকে সহসা সেই মন্ত্র হয়ে উঠল প্রাণময়। সেই মহামন্ত্র এলো পুঁথি থেকে প্রাণে। বাঙালীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো মাতৃপূজার মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'।

বঙ্কিমের এই মন্ত্রকেই আমাদের প্রাণের মধ্যে সেদিন পৌঁছে দিয়েছিলেন অরবিন্দ। বাংলার সেদিনের তরুণ বিপ্লবীরা এই মন্ত্রকেই তাদের কণ্ঠে নিয়ে দেশের কাজে নেমেছিলেন। অরবিন্দই সর্বপ্রথম অনুভব করেন—সমস্ত ভারতবাসীকে মাত্র এই মন্ত্র সম্বল করেই স্বাধীনতার অগ্নিময় পথে অগ্রসর হতে হবে। এই মন্ত্রের মধ্যে, এই সংগীতের মধ্যে যে মহাশক্তি নিহিত আছে বাঙালীকেই সকলের আগে তা পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুরও জীবনমন্ত্র ছিল এই বন্দেমাতরম্।

কার্জনের এই বঙ্গ-বিভাগ যেন ইতিহাসের অভিপ্রেত ছিল। এই প্রসঙ্গে একজন ঐতিহাসিক যথার্থই লিখেছেন : "Thus Curzon caused deep resentment in the people and created an explosive situation in the country which

took a violent turn in 1905. His Partition Scheme served as the spark that ignites powder into an explosion ...It marked a turning point in our nationalist history." এই স্বদেশী আন্দোলনের আগেও স্বাধীনতার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি। ১৮৮৫ সনে জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই আমরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যে আন্দোলন করে আসছিলাম এতকাল তা সংগ্রাম ছিল না—তা ছিল আবেদন-নিবেদন। এই ছিল সে যুগে কংগ্রেস নেতাদের দাবি আদায়ের পথ। সেই আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ১৯০৫ সনে একটা নূতন মোড় নিল। সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যার মুখে প্রাচীনপন্থী নেতাদের অনেক মতবাদ ভেসে গেল। তাঁরা বলেছিলেন—কংগ্রেসের লক্ষ্য হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। নবীনেরা বললেন—'স্বরাজ' ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার। সেদিন অরবিন্দের কণ্ঠ হতেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল—"We want absolute autonomy free from British control." ১৮৯৫ সনে মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসবে লোকমান্য টিলক সর্বপ্রথম এই 'স্বরাজ' কথাটি ব্যবহার করেন। তারপর থেকেই নবীনদল এই 'স্বরাজ' কথাটির ব্যবহার করতে থাকেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের বদলে এখন থেকে স্বরাজের লক্ষ্যটিই নবীনদল গ্রহণ করলেন। অরবিন্দ কিন্তু আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বললেন—শুধু স্বরাজ নয়, ইংরেজের শাসনমুক্ত সার্বভৌম স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সেদিন জাতির সামনে এই লক্ষ্যটাকেই তুলে ধরেছিল আর এই লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসাবে সে যেমন গ্রহণ করেছিল বয়কট বা বিলিতি বর্জনের নীতি, তেমনি গ্রহণ করেছিল সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। বিপ্লব-রথের সারথি ছিলেন অরবিন্দ আর বিপ্লব-পথের নির্ভীক পথিক ছিলেন ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই,

বাঘা যতীন আর রাসবিহারী বসু প্রমুখ তরুণ বাঙালী সন্তান। সেদিনের বাংলার এঁরাই ছিলেন নাগশিশু।

বাংলার তরুণদল বঙ্গ-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলনকে পুরানো প্রথার পরিবর্তনের সুযোগ বলে মনে করলেন। বাংলার নানা স্থানে গুপ্ত-সমিতি গঠিত হলো। স্বদেশী আন্দোলন চলেছিল পুরো আট বছর—এই আট বছরের মধ্যেই এটা পরিণতি লাভ করে একটা বিরাট জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল। বাংলার স্বদেশী প্রচার ও বিদেশী বয়কট আন্দোলন দমনের জন্য ইংরেজ সরকারের চণ্ডনীতি যতো প্রবল হতে লাগল, বিপ্লবীদলের কর্মতৎপরতাও ততো বেড়ে যেতে লাগল। এই কর্মতৎপরতা শক্তিসাধনারই নামান্তর ছিল। শক্তি ও স্বাস্থ্যচর্চায় মন দিল বাঙালী ছেলেরা। ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হলো 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন সমিতি' নামে দুটো গুপ্ত-সমিতি। সারা বাংলায় অনুশীলন সমিতির শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠল। কলিকাতা ও ঢাকা ছিল এই সমিতির প্রধান কেন্দ্র। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নায়ক ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিন দাস। সমিতির তরুণ সভ্যদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এখানে লাঠিখেলা, মুগুরভাঁজা, অসিখেলা, কুস্তি, সামরিক ধরনের কুচকাওয়াজ প্রভৃতি ব্যায়ামচর্চাও চলত। আবার তাদের ঘোড়ায় চড়া, রিভলবার ও বন্দুক চালানোও শিক্ষা দেওয়া হতো।

কিন্তু শুধু শরীরের বল দিয়ে বিপ্লব করা যায় না। মনের বলও দরকার। তাই ভবিষ্যতের বিপ্লবীদের মানসিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য অধ্যয়ন অপরিহার্য বিবেচিত হলো। বৈপ্লবিক সাহিত্যের বহুল প্রচারের জন্য বিপ্লবীদলের প্রচেষ্টায় 'ছাত্রভাণ্ডার' নামে একটি কেন্দ্রীয় পুস্তক-প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় গড়ে উঠল। পরে মেদিনীপুর, ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি বাংলার বহু জেলা শহরে ছাত্রভাণ্ডারের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মনে স্বদেশসেবার প্রেরণা

জাগিয়ে তুলতে এখানে স্বদেশী গান, স্বদেশী কবিতা প্রভৃতি পড়ানো হতো এবং স্বদেশপ্রেমিক জাতীয় নেতাদের স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এ ছাড়াও চরমপন্থীদের পরিচালিত 'বন্দেমাতরম্', 'নবশক্তি', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি দেশাত্মবোধক ও রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে বাংলার অগ্নিশিশুদের সম্মুখে নব নব উদ্দীপনার আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিল।

১৯০৬ সনের গোড়াতেই বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ যখন বাংলায় এলেন তখন থেকেই মাতৃপূজার অঙ্গন যেন কলরবমুখরিত হয়ে উঠল। তিনিই প্রথম বলেছিলেন—কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির উপর ভরসা করলে চলবে না। জাতিকে 'অগ্নি ও রক্ত-স্নানে' পবিত্র হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। এর আগে এমন কথা আর কেউ বলেন নি—এমন নূতন কথা বাঙালী আর কখনো শোনে নি। এই অরবিন্দের হাতে রণভেরী ছিল 'বন্দেমাতরম্' ইংরেজি পত্রিকা; প্রথমে এই কাগজ সাপ্তাহিক রূপে আরম্ভ হয়েছিল, পরে এটা দৈনিকে পরিণত হয়। এর আগে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রদূতরূপে ১৯০৫ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' কাগজ। প্রতিবাদ-আন্দোলনের ধূমায়িত অবস্থায় এই 'সন্ধ্যা' বাঙালীকে প্রেরণা দিয়েছে কড়াপাকের উগ্র রাজনীতি পরিবেশন করে।

অদ্ভুত মানুষ এই গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ইনিই ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্রের একজন যথার্থ উত্তরসাধক। স্বদেশী যুগের ইতিহাসে স্বাদেশিকতার স্তম্ভরূপে এঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে আছে। ব্রিটিশ রাজশক্তি এঁকে পরাজিত করতে পারেনি। নিজের অসামান্য আত্মবল নিয়ে উপাধ্যায় দাঁড়িয়েছিলেন ব্রিটিশরাজের শক্তির বিরুদ্ধে। কি তেজস্বিতায়, কি বলিষ্ঠতায়, কি নির্ভীকতায় এঁর তুলনা ছিল না।

জ্ঞানে, গুণে, পাণ্ডিত্যে আর সকলের উপর জ্বলন্ত দেশপ্রেমে ইনি ছিলেন এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ। তাঁর সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' কাগজ সেদিন জাতীয় চিত্তে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই কাগজে তিনি অগ্নিস্রাবী অথচ অতি সাধারণ লোক বুঝতে পারে এমন সরল ভাষায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ অকুণ্ঠভাবে চালিয়ে যেতেন। কার্জনী বিধান তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ তিনি চালাতে লাগলেন লেখার ছত্রে ছত্রে আগুন ঢেলে দিয়ে। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে 'সন্ধ্যা'র অগ্নিবর্ষী রচনা বড়ো কম সহায়তা করে নি। তিনি যখন রাজদ্রোহী বলে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন তখন ব্রহ্মবান্ধব দৃপ্ততেজে বলেছিলেন: "রাজশক্তির ক্ষমতা নেই আমাকে কিছু করতে পারে —ইংরেজের সাধ্য নেই আমায় জেল দেয়।" মামলা চলবার সময়েই হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

'সন্ধ্যা'র পরে আসরে নামল 'যুগান্তর' ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন অগ্নিযুগের সাগ্নিক-ঋষি, অরবিন্দ-অনুজ বারীন্দ্র-কুমার ঘোষ এবং এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বাংলার অন্যতম বিপ্লবী ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সবশেষে রণভেরী বাজিয়ে এলো 'বন্দেমাতরম্' ১৯০৬ সনের আগস্ট মাসে। এইভাবে দেশজননী তখন তিনমুখে জাতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর এক মুখ হলো 'বন্দেমাতরম্', আর দুটি মুখ হলো 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর'। 'বন্দেমাতরম্' পৌঁছত সারা ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকের কাছে, 'সন্ধ্যা' আর 'যুগান্তর' ছিল বাংলার নিজস্ব কাগজ। 'সন্ধ্যা'র ভাষা ছিল প্রতিদিনের ভাষা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার ভাষা। 'যুগান্তর' প্রস্তুত করত সাধারণ মানুষের মনে আসন্ন বিপ্লবের বেদী। আর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ধ্বনিত হতো পূর্ণ স্বাধীনতার অকুণ্ঠ দাবী। বন্দেমাতরমের অগ্নিবর্ষী রচনার

বিদ্যুৎ স্পর্শে সচকিত হয়ে ওঠে ভারতবাসী, আর সন্ত্রস্ত হয় শাসকবর্গ। সেদিন বাংলা তথা ভারতের মরাগাঙে নূতন প্রাণের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল এই তিনখানি কাগজ এবং এই কাগজ তিনখানিকে কেন্দ্র করেই একদিকে স্বদেশপ্রেম আর স্বাজাত্যবোধ তীব্র হয়ে ওঠে আর অন্যদিকে সকলের অলক্ষ্যে রচিত হয় বিপ্লবের অগ্নিবেদী। তখন থেকে বাংলায় যে বিপ্লববাদ জন্ম নিয়েছিল তার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল দুটি ; যথা, এক—স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তিগত জীবন দান অর্থাৎ "মেরে মরা" যার দৃষ্টান্ত পাই সত্যেন ও কানাই প্রমুখ বিপ্লবীদের জীবনে ; দ্বিতীয়, স্বাধীনতার জন্য চরম আত্মসমর্পণ। যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী ছিলেন এই শেষোক্ত আদর্শের দুটি বিগ্রহ-মূর্তি। এই আদর্শেরই পরাকাষ্ঠা আমরা দেখেছি রাসবিহারীর জীবনে।

দুই

রাসবিহারী বসুর জীবনের পটভূমিকা হিসাবে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস আরো একটু আলোচনা করা দরকার। ১৯০৭ সনের গোড়া থেকেই দিকে দিকে, গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠতে থাকে অনুশীলন-সমিতি। আর নিঃশব্দে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সংঘবদ্ধ হয়ে সৃষ্ট হয় একাধিক গুপ্ত-সমিতি। কলিকাতা ছিল বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। দেহের শক্তি, মনের শক্তি, চরিত্রের শক্তি—এই তিন শক্তির অনুশীলনে মেতে উঠল তরুণ বাঙালী চরম একনিষ্ঠ ভাবে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' আর 'গীতা' বাঙালীকে দিয়েছিল এই শক্তির সন্ধান। এই গীতাকে সেদিন সকলের আগে নব-ক্ষত্রিয়দের হাতে তুলে দিয়েছিলেন রণগুরু অরবিন্দ। তরুণ বাংলা তরুণ ভারত ভয়মুক্ত অন্তরে ক্ষত্রিয়ের কাম্য রণে-মৃত্যু বরণ করতে ছুটলো।

'আনন্দমঠের' আদর্শটা দেশের তরুণদের নূতন করে বুঝিয়ে দিলেন অরবিন্দ। বললেন—স্বদেশসেবার জন্য কেবল জীবনদানই সব নয়। প্রথমে একাগ্র কঠিন সাধনায়, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, জ্ঞানে-অভিজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে, দেহে ও মনে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে হবে। তারপরে সেই মূল্যবান প্রাণ পরম নিষ্ঠায় দেশ-মাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে হবে। এই আদর্শকেই জাতির চারণ-কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন অপরূপ ছন্দে ও ভাষায় রূপ দিয়ে লিখলেন:

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা।......
......শুধু জানি। যে শুনেছে কানে

তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে,
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।"

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সেই বাণী—"হে ভারত! ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত।" —এই সময়ে বাংলার যুবশক্তির উদ্বোধনে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিল। এইসব বাণী থেকেই বাঙালী তরুণ বুঝেছিল যে দেহের শক্তি নির্ভর করে চরিত্রের শক্তির উপর। ক্ষণ অস্তিত্বকে এক অপূর্ব দিব্যশক্তিতে বিমণ্ডিত করে তোলার প্রেরণা সে পেয়েছিল অরবিন্দের কাছ থেকেই। যে 'অভীঃ'-মন্ত্র উচ্চারণ করে এই শতাব্দীর সূচনায় স্বামী বিবেকানন্দ বিদায় নিয়েছিলেন, সেই কথা বাঙালী যুবকদের শুনিয়ে অরবিন্দ তাঁর 'বন্দেমাতারম্' পত্রিকায় লিখেছিলেন: "Courage is your principal asset. Heroism feels and never reasons, and therefore is always right." এই সাহস ভিন্ন দেশোদ্ধার সম্ভব নয়, অরবিন্দের এই বাণী সকল বিপ্লবীদের মনে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল—বিশেষ করে দুইজন বিপ্লবীর মনে—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর রাসবিহারী বসু। দেশের তরুণদের এই নির্ভীক হৃদয় থেকেই ইতিহাসের এক শুভলগ্নে আবির্ভূতা হলেন দেবী ছিন্নমস্তা। বাংলার নব-ক্ষত্রিয়ের দল ছিন্নমস্তার পূজায় বসবার আয়োজন করেন। এইবার তাঁরা মায়ের চরণে প্রাণের অঞ্জলি নিবেদন করতে প্রস্তুত হন। প্রথম অঞ্জলি নিবেদন করলেন অগ্নিযুগের নাগ-শিশু ক্ষুদিরাম।

১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল।

ঐদিন রাত্রিবেলায় বিহারের মজঃফরপুরের মাটিতে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তা ছিল ইতিহাসেরই অগ্ন্যুদগার। এই অগ্ন্যুদগার একদিনে

হয়নি। একদিনে বাসুকীর ফণা তুলে ওঠে না—তিলে তিলে যখন একটা পরাধীন জাতির অন্তরে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিমান ফেনিয়ে উঠতে থাকে, তখনি তুলে ওঠে বাসুকীর ফণা, তখনি তো ঘটে অগ্ন্যুদগার, তখনি ছুটে আসে বিপ্লবের রক্ত তুরঙ্গম। মজঃফরপুরের সেই অগ্ন্যুদগার ছিল একটা নিপীড়িত পরাধীন জাতির শত বৎসর-কালের পরাধীনতার বেদনারই মূর্ত অভিব্যক্তি। তখন কলিকাতা শহরে মুরারীপুকুরের বাগান-বাড়িতে চলেছে বাঙালীর বিপ্লব-যজ্ঞ। মানিকতলায় বত্রিশ নম্বর মুবারীপুকুর বাগান রোডের সেই বাড়িটা আজো অতীত দিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এইখানে এই উঁচু পাঁচিল দেওয়া বাড়িতে বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, উল্লাসকর এবং আরো অনেক বিপ্লবী সমবেত হয়ে নিভৃতে বিপ্লব-যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছিলেন। এই যজ্ঞেবই তুইটি সমিধ ছিল কিশোর ক্ষুদিরাম বসু আর তরুণ প্রফুল্ল চাকী।

সেই বাগান-বাড়িতে বোমা তৈরি হয়। বারীন্দ্র এখান ওখান থেকে টাকা সংগ্রহ কবে বিভলবার কিনে এনে মজুত করেন সেখানে। বাংলাদেশের নানাস্থানে তখন বিপ্লবীরা ডাকাতি কবে টাকা সংগ্রহ করতেন। কারণ বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল প্রচুব অর্থের। প্রথম প্রথম এই দেশের কয়েকজন দেশপ্রেমিক ধনীর বদান্যতায় গুপ্ত-সমিতির অর্থ-ভাণ্ডার পুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু যখন তাঁদের বদান্যতার ধারা মন্দীভূত হয়ে এলো, তখন অর্থ সংগ্রহের জন্য বাধ্য হয়ে বিপ্লবীদের ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হয়। এই প্রচেষ্টাই বাংলার রাজনৈতিক ডাকাতি বলে প্রখ্যাত। নিজের স্বার্থে নয়, দেশেব স্বার্থেই তাঁরা এই ডাকাতি করতেন। বঙ্গ-বিভাগের ফলে বিক্ষোভ প্রকাশের প্রয়োজনে নিয়মতান্ত্রিক দলের নেতারা একদিকে যেমন কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা, তেমনি

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী দলের নেতাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় বিপ্লবীরা গ্রহণ করেছিলেন অন্য ধরনের কর্মসূচী। স্বদেশী ডাকাতি ছিল এরই অন্তর্গত। একদিকে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেমন হাজার হাজার জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির উত্তরে ছোট বড়ো অনেক স্বদেশী ডাকাতি হয় বাংলার বিভিন্ন স্থানে। সেইসব ডাকাতির মধ্যে ১৯০৮ সনের ২রা জুন ঢাকা জেলার বরা গ্রামের, ৩০শে অক্টোবর ফরিদপুরের নড়িয়া গ্রামের এবং ১৯০৯ সনের নদীয়ার হলুদবাড়ির ডাকাতিই উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত ডাকাতির লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ছিল ছাব্বিশ হাজার।

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতিগুলির অনুপ্রেরণায় দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার তরুণ ছাত্রসমাজও এগিয়ে এসেছিল। তারাই এই স্বদেশী আন্দোলনকে আশাতীত সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। তারা সারা বাংলায় স্বদেশী গান গেয়ে বেড়াত, বাংলার প্রতি ঘরে ফেরী করে বিক্রী করত স্বদেশী দ্রব্য, বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করত আবার অনেক স্থলে ম্যানচেস্টারের কাপড় পুড়িয়ে দিয়ে বহ্ন্যুৎসব করত। এই ছাত্রসমাজের কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য সরকার এক আদেশ জারী করলেন—"রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ।" কিন্তু ছাত্রদের সম্মুখে তখন নব আশার উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি—তাদের অন্তরে জেগেছে ইতিপূর্বে অননুভূত প্রেরণার অপূর্ব স্পন্দন, তারা মানবে কেন সরকারী আদেশ? ইতিহাসে এই কুখ্যাত সরকারী আদেশ 'কার্লাইল সার্কুলার' নামে অভিহিত হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি। সরকারী আদেশ অমান্য করে স্কুল-কলেজের বহু ছাত্র বিপুল উৎসাহে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল। ফলে তাদের অনেককেই স্কুল-কলেজ থেকে

বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়। বাংলায় ছাত্র-বিক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। এই সব বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলো বহু জাতীয় বিদ্যালয়, এমন কি একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। সেদিন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য-চৌধুরী, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর তারকনাথ পালিত প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিক দানবীরের অর্থসাহায্যে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' (National Council of Education) নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, তারই অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। এই ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন পরে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হয় এবং স্বাধীনতালাভের পরে ইহা বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

আগেই বলেছি, রাজদ্রোহের অভিযোগে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। তখন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডি. এস. কিংসফোর্ড। অত্যন্ত অত্যাচারী বলে তাঁর কুখ্যাতি ছিল। তাঁরই এজলাসে 'সন্ধ্যা'র মামলা দায়ের হয়েছিল। সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণে ভারতীয়দের অবমাননা ও লাঞ্ছনা করতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করতেন না। আমরা যখনকার কথা বলছি তখন এক বাংলা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট নিযুক্ত হয়েছিলেন স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার আর পশ্চিমবঙ্গে ছোটলাট নিযুক্ত হয়েছিলেন ফ্রেজার সাহেব। রংপুরে ফুলারকে হত্যা করবার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, তখন বিপ্লবীরা ফ্রেজারকে হত্যা করার আয়োজন করে। ট্রেনে করে তিনি যখন মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন তখন নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে ঐ ট্রেন ধ্বংস করার চেষ্টা হয়। ট্রেনটি বোমার বিস্ফোরণের ফলে লাইনচ্যুত হয়, কিন্তু ফ্রেজার প্রাণে বেঁচে যান। এ ঘটনা ১৯০৭ সনের ৬ই ডিসেম্বর ঘটেছিল। তারপর ঐ ডিসেম্বরের

শেষভাগে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন সাহেবকে গোয়ালন্দ স্টেশনে গুলী করে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সেবারের মতো প্রাণে বেঁচে গেলেও পরে তিনি বিপ্লবীদের গুলীর আঘাতেই প্রাণ হারান। এরপরই কুষ্টিয়ার পাদ্রী হিকস্‌কে গুলী করা হয়। অতঃপর চন্দননগরের অত্যাচারী মেয়র মঁসিয়ে তার্দিভিলের ভবনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এ ঘটনা ১৯০৮ সনের ১১ই এপ্রিল ঘটেছিল। এরই অল্প কয়েকদিন পরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্য বিপ্লবী নেতারা কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

আদালতে 'সন্ধ্যার' মামলা উঠেছে। মামলার প্রথম দিন মুদ্রাকরকে বর সাজিয়ে নিজে পুরোহিতের বেশে আদালতে এলেন উপাধ্যায়। পরনে রেশমের ধুতি, গায়ে চাদর, গলায় মোটা ধবধবে শাদা পৈতা। আদালতে এলেন তিনি ব্যাণ্ড বাজিয়ে। ব্যাণ্ডে বাজে—"বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।" আদালতের সামনে লোকে লোকারণ্য। সমবেত জনতার কণ্ঠে মেঘমন্দ্রে চীৎকার ওঠে—বন্দেমাতরম্! আদালতের ভেতরে এজলাসে, কিংসফোর্ডের কানে গিয়ে পৌঁছয় সেই উত্তাল গর্জন। খানিক বাদে সেই ব্যাণ্ড পার্টির শব্দ আসে তাঁর কানে। আদালতের পেশকারের কাছে সব শুনে কিংসফোর্ডের লাল মুখ রাগে আরো লাল হয়ে উঠল। বাইরে তখন সমবেত জনতা অস্থির হয়ে উঠেছে। সার্জেণ্ট তাদের রুখতে পারে না। জনতার বেশির ভাগই ছিল স্কুলের ছাত্র। তারা শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টকে ক্ষেপাতে শুরু করে। তাকে দেখে, আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে ওঠে। সার্জেণ্ট রাগে ফুলতে থাকে। তেড়ে আসে—লোকজন পালিয়ে যায়। কিন্তু তাকে রুখে দাঁড়ায় তেরো বছরের একটি কিশোর ছাত্র। নাম তার সুশীল সেন। সার্জেণ্ট তাকে ধরে ফেলে। সার্জেণ্টের মুখের ওপর সুশীল একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে

কিংসফোর্ডের এজলাসে আনা হয়। সার্জেণ্ট তার বিরুদ্ধে দাঙ্গা করার অভিযোগ নিয়ে এলো। কিংসফোর্ড তখনি হুকুম দিলেন—আদালতের সামনেই একে ষোল ঘা চাবুক মারা হোক। আদালতের প্রাঙ্গণে থামের সঙ্গে বাঁধা হয় সুশীলকে। এক একবার তার খোলা পিঠে বেত পড়ে আর ছেলেটি অমনি চীৎকার করে ওঠে—বন্দেমাতরম্। ম্যাজিস্ট্রেট তা দেখে স্তম্ভিত হন। এতটুকু ছেলে, তবু তার কি মনের জোর!

সুশীলকে বেত মারার খবর গিয়ে পৌঁছল বিপ্লবী নেতাদের কাছে। তাঁরা কিংসফোর্ড-নিধনের ব্যবস্থা করেন। এক নূতন ব্যবস্থা। বই-এর ভেতরে বোমা। উল্লাসকর দত্ত তৈরী করেছিলেন এই বিচিত্র বোমা। একটা মোটা বই-এর পাতা কেটে একটা গোল গর্ত করে তার ভেতরে বোমাটি নিজের হাতে বসাল ক্ষুদিরাম। ডাকযোগে সেই বই-বোমা গেল কিংসফোর্ডের কুঠিতে। কিন্তু বিপ্লবীদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কলিকাতায় থাকা আর নিরাপদ নয় ভেবে কিংসফোর্ড বদলী হয়ে মজঃফরপুব চলে এলেন। কিন্তু বিপ্লবের হাত মজঃফরপুর পর্যন্ত প্রসারিত হলো। তাকে মারবার জন্য সেখানে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীকে। ১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল। রাত্রিকাল। রাস্তার ধারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। দূরে একটা ফিটনেব শব্দ শোনা গেল। ঐ কিংসফোর্ডের ফিটন আসছে, বলে প্রফুল্ল। অমনি দু'জনে পকেট থেকে হাত-বোমা বের করে নেয়। ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ফিটন তাদের সামনে এসে পড়ে। দু'দিক থেকে অন্ধকারে তারা বোমা নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আওয়াজ। দু'জনে দু'দিকে ছুটে পালায়। গাড়িতে আগুন ধরে গেল। কিংসফোর্ড মরলেন না—মরলেন মিসেস কেনেডী আর তাঁর মেয়ে। তিনি সেই গাড়িতেই ছিলেন না।

মজঃফরপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বাংলার ইতিহাসে আবির্ভাব হয় রুদ্রের প্রমত্ত পদক্ষেপ। দিগ্‌দিগন্তে বেজে উঠল বিপ্লবের বিষাণ। বিদ্যুৎগতিতে সেই সংবাদ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের লেলিহান শিখা সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হলো। এই ঘটনার পরেই পুলিশ বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ফেলল সমস্ত দেশটাকে। হানা দিল মানিকতলার বাগান-বাড়িতে, গ্রে স্ট্রীটে অরবিন্দের বাসভবনে। মানিকতলায় তারা আবিষ্কার করল বোমা তৈরির ছোটখাটো একটা কারখানা। বিভিন্ন স্থানে প্রায় চল্লিশজন বিপ্লবী নেতা ধরা পড়লেন—এঁদের মধ্যে প্রধান আসামী হিসাবে যাঁকে গণ্য করা হয় তাঁর নাম অরবিন্দ ঘোষ। আলিপুরেব দায়রা জজ বীচক্রফটের এজলাসে এই মামলার বিচার হয়েছিল বলে ইতিহাসে এর নাম আলিপুর বোমার মামলা। এই মামলা চলেছিল এক বছর। এই মামলার বহুবিধ চিঠিপত্রের মধ্যে রাসবিহারী বসুর লেখা একখানা চিঠিও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তখন পুলিশ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারে নি যে তিনি এই পথেরই একজন পথিক ছিলেন। সে কথা পরে বলব।

১৯০৮, ১১ই আগস্ট মজঃফরপুরের জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হলো। তখন তার বয়স হয়েছিল উনিশ বছর। বিপ্লবী বাংলার তিনিই প্রথম শহীদ। হাসিমুখে তিনি ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন—ফাঁসির মঞ্চে উঠতে তাঁর পা এতটুকু কাঁপেনি। যাঁরা এই কিশোরের ফাঁসির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, জল্লাদ যখন ক্ষুদিরামের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেয়, তখনো পর্যন্ত দৃঢ়তার ও তেজস্বিতার অপূর্ব দিব্যকান্তিতে তাঁর মুখখানি উদ্ভাসিত ছিল। আলিপুর জেলে বসে আলিপুর বোমার মামলার অরবিন্দ প্রমুখ অভিযুক্ত আসামীগণ এই সংবাদ পাঠ করলেন।

ফাঁসির মঞ্চে উঠবার আগে এই কিশোরের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়েছিল

শুধু এই কথাটি: "মা গো, যায় যাবে জীবন চলে, শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।" মাতৃপূজার প্রথম বলি ক্ষুদিরাম। দুরন্ত ছেলে জাগিয়ে দিয়ে গেল ঘুমন্ত ভারতকে। টলিয়ে দিয়ে গেল ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্যের ভিৎ। আলিপুরের বোমার মামলা চলতে থাকে। এত বড়ো স্বদেশী মামলা এযুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে আর হয় নি। আর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ এমন সব হীরের টুকরো ছেলেও কখনো রাজনৈতিক আসামী হিসাবে কাঠগড়ায় দাঁড়ায় নি। এই মামলার বিচারক যিনি, আলিপুরের সেই দায়রা জজ বীচক্রফট সাহেব ছিলেন বিলেতে অরবিন্দেরই সহপাঠী। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অরবিন্দ ইংরেজীতে তাঁর চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেদিনের উদীয়মান ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ —যিনি পরবর্তীকালে 'দেশবন্ধু'রূপে জাতির হৃদয়-সিংহাসনে শাশ্বত স্থান লাভ করেন। বর্তমান ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন এই মামলার প্রধান আসামী। তাই এই মামলাটি সেদিন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় রচনা করেছিল।

এই স্মরণীয় মামলায় প্রধান আসামী হিসাবে আদালতের কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে অরবিন্দ যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন: "আমি দেশে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছি। এ কাজ যদি আইন-বিরুদ্ধ হয়, তা'হলে আমি স্বীকার করছি যে আমি দোষী। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা যদি অপরাধ হয়, আমি তা করেছি। আর আমি যা করেছি তা আমি কেন অস্বীকার করব? এই স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবনের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। এরই জন্য জীবন ধারণ করেছি, শ্রম স্বীকার করেছি। এই স্বাধীনতাই আমার জাগরণের চিন্তা, নিদ্রার স্বপ্ন। এই যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, তা'হলে আর

সাক্ষী-সাবুদের কি প্রয়োজন ? আপনাদের আইনে যে শাস্তি আছে আমাকে দিন। আপনারা আমাকে কারারুদ্ধ করতে পারেন, দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারেন, এমন কি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন। কিন্তু আমার এই অপরাধ আমি কিছুতেই অস্বীকার করব না। আমি অকুণ্ঠভাবে বলতে চাই যে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোনো ধারামতেই অপরাধ নয়।"

"স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোনো ধারা মতেই অপরাধ নয়"—অতি বড়ো আইনজ্ঞের মুখ দিয়েও এমন অকাট্য যুক্তি কখনো শোনা যায় নি। একমাত্র টিলক ভিন্ন ভারতের আর কোনো রাজনৈতিক আসামীর মুখ থেকে এমন কথা ভারতবাসী আর কখনো শোনে নি। তখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা রাজদ্রোহিতা বলেই গণ্য করা হতো। সাহস করে স্বাধীনতার কথা কেউ বলতেই পারতেন না। এই বিধানের বিরুদ্ধে সেদিন নির্ভীক-ভাবে দাঁড়িয়ে শ্রীঅরবিন্দ জাতির জন্য যে কতো বড়ো অধিকার অর্জন করেছিলেন, তার মর্ম অনুধাবন করেছিলেন শুধু একজন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে রচিত একটি কবিতায় তিনি তাই লিখেছিলেন ঃ

"সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের তরে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।"

সেদিন থেকেই এদেশে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করার পথ মুক্ত হলো। একে অপরাধ বলে গণ্য করতে গভর্নমেণ্ট আর কখনো সাহস পায় নি। অরবিন্দের স্বল্পকালস্থায়ী রাজনৈতিক জীবনের

সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা এই অধিকার অর্জন। এই অধিকারই সেদিন প্রশস্ত করে দিয়েছিল পরবর্তীদের সংগ্রামের পথ।

অরবিন্দের জবানবন্দী যেমন স্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি এই মামলার আসামী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী হিসাবে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সওয়ালও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মামলার শেষ শুনানীর দিন বিচারক ও জুরিদের উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন: "আপনারা মনে করবেন না যে, আজ এই আদালতে এইখানেই এই মামলার শেষ। মানব-ইতিহাসের বিরাট বিচারালয়েও এই মামলার শুনানী চলবে। একদিন যখন আপনাদের সমস্ত বিচার-বিতর্ক একেবারে নীরব হয়ে যাবে, যখন আজকের দিনের এই আন্দোলন আর উত্তেজনার কোনো চিহ্নই পরে থাকবে না...আজ যিনি আসামী হয়ে আদালতের সামনে দাঁড়িয়েছেন একদিন তিনিও এই পৃথিবী থেকে চলে যাবেন। তবুও সেই অনাগত যুগের মানুষ একমাত্র এই অরবিন্দকেই স্মরণে রাখবে দেশপ্রেমের কবি বলে, জাতীয়তার ঋষি বলে। মানবতার উপাসক বলে সমগ্র পৃথিবী তাঁকেই দেবে পুষ্পাঞ্জলি। আজ যে বাণী প্রচারেব জন্য তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন, সেদিন সেই বাণীর তরঙ্গ দেশে-দেশান্তরে মানবের অন্তরে অন্তরে মহাভাবের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।"

চিত্তরঞ্জনের ভবিষ্যদ্বাণী মহাকালের বুকে সঞ্চিত হয়ে রইল। এই মামলা যখন চলছিল তখন সরকার রেগুলেশন আইনে বাংলার কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতাকে আটক করে দেশান্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত অরবিন্দ বিচারে বেকসুর খালাস পেলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসি, অরবিন্দের জবানবন্দী আর চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব সওয়াল এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাব জাতিকে করে তুলেছিল নির্ভীক আর এর থেকে পরবর্তী

যে-সব বিপ্লবী তাঁদের দুর্গম পথের পাথেয় সঞ্চয় করেছিলেন, আমাদের আলোচনার নায়ক রাসবিহারী বসু ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম এবং অনেক বিষয়ে প্রধানতম। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের ভাবধারাপুষ্ট এই বিপ্লবী বীরের জীবনের কৈশোর ও যৌবনকাল এই অগ্নিগর্ভ পরিবেশের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল।

তিন

"আমি এক যোদ্ধা ছিলাম।"

এই কথা বলেছেন রাসবিহারী বসু। যোদ্ধার জয়তিলক ললাটে ধারণ করেই তাঁর জন্ম এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নির্ভীক যোদ্ধাই ছিলেন। এই যোদ্ধার জীবন-কাহিনী ইতিহাসের যে-কোনো বিখ্যাত যোদ্ধার জীবনের কাহিনীর মতোই রোমাঞ্চকর। ভারত থেকে জাপান এবং জাপান থেকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ছড়িয়ে আছে রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস। সেই ইতিহাস আজো সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয় নি। সম্ভবত এই কারণেই তাঁর সম্পর্কে বাংলাভাষায় একখানি পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ জীবনচরিত রচিত হয় নি।

বাঙালীর কাছে বাংলার এই বীর সন্তানের পরিচয়—যাঁর দেশপ্রেম আর দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি মহিমময় অধ্যায়রূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য—আজো অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। আমাদের মানসপটে তিনি আজ তাই অর্ধেক কল্পনা আর অর্ধেক কিংবদন্তীরূপে বিরাজ করছেন। এ সত্যিই আমাদের পক্ষে লজ্জা ও অগৌরবের কথা। এই শতকে ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে আমরা নেতৃস্থানীয় যে দুই-তিনজনকে পাই তাঁদের মধ্যে, আমার বিবেচনায় বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) পরেই বোধ হয় রাসবিহারী বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। এই দুইজনের মধ্যে বয়সের অবশ্য পার্থক্য ছিল এবং যতীন্দ্রনাথই ছিলেন বাংলার সক্রিয় বিপ্লবীদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। এই যতীন্দ্রনাথের পর যে নামটি একদা ভারতের স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক তরুণ বিপ্লবীচিত্তে

প্রেরণা জোগাত, যে নামটি প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ রাজশক্তির নিকট বিশেষ ভীতির কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তিনি আর কেউ নন, রাসবিহারী বসু। এ কথা ভেবে আমরা লজ্জা পাই, দুঃখ বোধ করি যে, "যাঁহার জীবন উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর, ত্যাগের মহিমায় জীবন যাঁহার উজ্জ্বল, গৌরব দীপ্তিতে ভাস্বর, স্বদেশে ও বিদেশে মুক্তি-সংগ্রামের দুইটি মহাবিপ্লবের যিনি অন্যতম জনক সেই মহানায়ক রাসবিহারী বসুর জীবনেতিহাস আজো ভারতে সর্বসাধারণের কাছে একরূপ অপরিজ্ঞাত।" অথচ কে না স্বীকার করবে যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই বিপ্লবীর কর্মপ্রয়াস ও চিন্তা-ভাবনা একটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। সেই অধ্যায় ইতিহাস-সম্মত ভাবে বিরচিত হওয়ার দিন আজ এসেছে।

রাসবিহারী বসুর জীবন-কথা প্রধানত চারটি পর্বে বিভক্ত। তাঁর জন্ম ১৮৮৬ সনে। এর ঠিক আগের বছর ভারতের জাতীয় মহাসমিতি অর্থাৎ কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত এই কুড়ি বছর তাঁর জীবন অতিবাহিত হয় বাংলাদেশে; ১৯০৭ থেকে ১৯১৫—তাঁর জাপান-যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবনের এই আট বছর অতিবাহিত হয় বাংলার বাইরে; ঐ সময়ে তিনি উত্তরপ্রদেশকে কেন্দ্র করে তাঁর বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষে তাঁর কর্মজীবনের পরিধি ছিল কম-বেশি উনত্রিশ বছরকাল। তাঁর জীবনের তৃতীয় অধ্যায় শুরু হয় ১৯১৫ সনে, যখন তিনি ভারত ত্যাগ করে জাপান চলে যান। এই জাপান শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি—যেমন আইরিশ দুহিতা কুমারী মার্গারেট নোবলের (যিনি পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে পরিচিতা হয়েছিলেন) কাছে এই ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি। ১৯১৫ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৫-১৯৩৯—এই

চব্বিশ বৎসরকাল হলো তাঁর জীবনের তৃতীয় অধ্যায়। আর ১৯৩৯ থেকে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত (২১ শে জানুয়ারী, ১৯৪৫) যে পাঁচ বছরকাল তাই হলো তাঁর জীবনের চতুর্থ বা শেষ অধ্যায় এবং এইটিই তাঁর জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়।

এই চারিটি পর্বে বিভক্ত তাঁর জীবনের উপাদান-উপকরণ প্রচুর, কিন্তু সেগুলি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ সেরূপ কোনো চেষ্টা আজ পর্যন্ত যথাযথভাবে করা হয় নি। যিনি "সমগ্র ভারতের বিপ্লব পরিকল্পনার জনক, সংগঠক ও মুখ্য নায়ক", সেই রাসবিহারী বসুর জীবনেতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে বাঙালী তথা ভারতবাসীর এই যে ঔদাসীন্য, এই যে অবহেলা—ইহা তাঁর স্বজাতির পক্ষে আদৌ শ্লাঘার বিষয় নয়। জাপানে জাপানীরা তাঁকে যে সমাদর, যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, জাপানী ভাষায় তারা যেরকম শ্রদ্ধার সঙ্গে এই বিপ্লবী নায়কের বিস্তারিত জীবন-চরিত রচনা করেছে, তা দেখে আমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। তাঁর সতীর্থ ও সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব জীবনস্মৃতি রচনা করেছেন এবং কেউ কেউ বিপ্লবযুগের ইতিহাসও রচনা করেছেন, কিন্তু সে-সব স্মৃতিকথা ও ইতিহাস গ্রন্থে রাসবিহারীর কথা খুব সামান্যই পাওয়া যায়। সকলেই নিজের নিজের ঢাক পিটিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'একজন ব্যতিরেকে আর কেউ-ই এই মানুষটির কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করেন নি, বা করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি।

রাসবিহারী স্বয়ং তাঁর জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন বলে জানা যায় না। সম্ভবত করেন নি। তাঁর জীবনচরিত আলোচনায় একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং এই শতাব্দীর সূচনাকালে যে জাতীয়তাবাদ বাংলা তথা ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিল, রাসবিহারী সেই

নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লব প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সার্থক হয়েছিল তাঁর জীবন। অন্যান্য বৈপ্লবিক নেতাদের মতো তিনি renegade ছিলেন না, তিনি রং পাল্টান নি। এই জাতীয়তাবাদ তাঁকে তাঁর লক্ষ্যে স্থির রেখেছিল এবং বৈপ্লবিক কর্মে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। যে জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, রাসবিহারী বসুর সমগ্র সত্তা ছিল তারই দ্বারা অভিসিঞ্চিত। এই জাতীয়তাবাদ ছিল নিষ্কাম কর্মের আদর্শের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। তাঁর 'ধর্ম ও জাতীয়তা' পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, এই আদর্শের কাছে ব্যক্তিগত জীবন তুচ্ছ, দেশের মুক্তিটাই মুখ্য। রাসবিহারীর সমগ্র জীবন ছিল এই আদর্শেরই একনিষ্ঠ সাধনা। তাই দেখা যায় যে, তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের শুরু থেকে তিনি একই লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছেন। কখনো মত বদলান নি। পথও বদলান নি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য এইখানেই। এই ক্ষেত্রে বোধ হয় তাঁর জীবনের সঙ্গে বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ বিনায়ক দামোদর সাভারকারের জীবন তুলনীয়।

ভারতে থাকাকালীন তাঁর যে-সব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার কথা জানা যায় তার যথাযথ বিবরণ কিছু সরকারী নথিপত্র থেকে, কিছু সমকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে আর তাঁর সতীর্থদের লিখিত স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত উপাদান সংগ্রহ করার জন্য বে-সরকারী উদ্যম আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছু হয়নি।* এই প্রসঙ্গে 'বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী

*শুনেছি কলিকাতা পুলিশের সদর দপ্তরের রেকর্ডরুমে *Confidential Police Reports about some Bengal revolutionaries during 1905-1915*—এই নামে যেসব বিবরণ সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে ডেনহ্যাম ও টেগার্ট রচিত রাসবিহারী বসু সম্পর্কে একটি ফাইল আছে। ঐ পুলিশ রিপোর্ট তাঁর জীবনচরিত রচনার পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান উপাদান। এই রেকর্ডগুলি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, নতুবা এই জাতীয় গবেষণার পক্ষে লেখকদের বড়ো অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

বসু স্মারক সমিতি'র নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এই সমিতির পক্ষ থেকেই সর্বপ্রথম তাঁর সম্পর্কে একখানি ইংরেজী গ্রন্থ আজ কয়েক বছর হলো প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই গ্রন্থখানিকে তাঁর যথার্থ জীবনী বলা চলে না তথাপি তাঁর জীবনের বহু উপাদান এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে। রাসবিহারী বসুর নাম যখন আমাদের স্মৃতিপটে একেবারে ম্লান হয়ে আসছিল, বাঙ্গালার এই বিপ্লবী বীর সন্তানকে আমরা সবাই যখন প্রায় ভুলতে বসেছিলাম, নেতাজীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত দেশে তাঁর বিপুল কর্মকীর্তির আড়ালে যখন এই বিপ্লবীর নাম চাপা পড়বার উপক্রম হয়েছিল, তখন আর্থিক অনটন ও অন্যান্য নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এই সমিতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাসবিহারী বসুর স্থান নির্ণয়-সূচক যে বিপুলায়তন গ্রন্থখানি (*Rash Behari Basu and his Struggle for India's Independence*) প্রকাশিত করেছেন, তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান এবং তাঁর জীবন-কাহিনী ও জীবনাদর্শের আলোচনার পক্ষে এটি অপরিহার্য। বস্তুত রাসবিহারী বসুর মৃত্যুর সুদীর্ঘকাল পরে ১৯৬৩ সনে প্রকাশিত এই বইখানির মধ্যে তাঁর জীবনের যে-সব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, ভবিষ্যতের গবেষকদের পক্ষে সেগুলি বিশেষ সহায়ক হবে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই জীবনী রচনায় এই বই থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন। এর নয় বৎসর পূর্বে জে. জি. অশওঁয়া প্রণীত *The Two Great Indians in Japan* বইখানিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও এই বইটিতে জ্ঞাতব্য তথ্য কিছু পাওয়া যায়। জাপানী ভাষায় লিখিত যে মূল জীবনী-গ্রন্থের ভিত্তিতে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে, এর ভূমিকাপ্রসঙ্গে সেই মূল গ্রন্থ সম্পর্কে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন : "It is a mine of informations and ought to be elaborated with further details of the life of the hero who died an exile under alien stars in

the land of the Rising Sun.” সেই গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনতিবিলম্বে অনূদিত হওয়া দরকার। অশওয়ার বইখানিতে আমরা রাসবিহারীর জীবনের যে চিত্র পাই, তা পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়, রেখাচিত্র বা স্কেচ মাত্র। তথাপি এ চিত্র বর্ণ-বিরল নয়।

রাসবিহারীর নিজস্ব রচনা ও পত্রাবলী তাঁর জীবনচরিতের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্মারকসমিতি প্রকাশিত গ্রন্থখানির মধ্যে তাঁর রচনার কিছু অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে, তবে তাঁর চিঠিপত্রের সংকলন অদ্যাবধি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ১৯১৫ সনে জাপান যাওয়ার পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সমকালীন বাংলা তথা ভারতের বহু বিপ্লবীনেতা ও কর্মীর সঙ্গে তিনি যে নিয়মিত পত্রালাপ করতেন, এমন নিদর্শন অনেক আছে। প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গেও তাঁর পত্র-বিনিময় হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তাঁর পত্রাবলী একত্র সংগ্রহ করে প্রকাশ করার দায়িত্ব আজ পর্যন্ত তাঁর স্বদেশবাসী গ্রহণ করল না। আমরা যে বাঙালী, এর থেকেই সেটা প্রমাণিত হয়। আমরা জানি রাসবিহারী শুধু একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তাঁর রচিত গ্রন্থের তালিকা নিতান্ত নগণ্য নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত গ্রন্থই তিনি লিখেছেন পাঁচখানি। প্রধানত ১৯৩৩ থেকে ১৯৪২ —এই নয় বৎসর কালের মধ্যে এইগুলি তিনি জাপানী ভাষায় রচনা করেন। বাংলায় এগুলির অনুবাদ হলে পরে নিঃসন্দেহে তা আমাদের দেশাত্মমূলক সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করবে এবং তাঁর জীবনাদর্শকে বুঝবার পক্ষেও তা আমাদের সহায়ক হবে। জীবনের যে ত্রিশ বৎসরকাল তিনি জাপানে অতিবাহিত করেছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নিজেকে কি ভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন, গান্ধীযুগের অহিংস আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন, তার

পরিচয় আছে তাঁর এই গ্রন্থগুলির মধ্যে। এ ছাড়া জাপানে অবস্থানকালে তিনি যে কয়খানি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং স্বয়ং যে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন, তাঁর জীবনচরিত রচনার অন্যতম উপাদান হিসাবে সেগুলিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিবর্তিত পটভূমিকায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঝড়ের বেগে পরিভ্রমণ করে ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে একাধিক জনসভায় রাসবিহারী যে-সব ভাষণ দিয়েছিলেন এবং লীগের একাধিক সম্মেলনে যোগদান করে তিনি যে-সব বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন ও বেতারভাষণ দিয়েছিলেন, তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের শেষ অধ্যায়েব উপাদান হিসাবে সেগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। তাঁর এই বক্তৃতাগুলি ঐ সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন ইংরেজের গোয়েন্দা পুলিশ সেগুলি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সংগ্রহ কবে লণ্ডনে পাঠিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ঐগুলি লণ্ডন থেকে উদ্ধার কবে ভারতে নিয়ে আসা দরকার।

রাসবিহারী বসুর জীবনের এইসব উপাদান যেদিন ঠিকমতো সংগৃহীত হবে, সেদিন তাঁব পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনা হয়ত সম্ভব হবে, কিন্তু আপাতত যা পাওয়া গিয়েছে তাই দিয়ে বর্তমান গ্রন্থখানি বিরচিত হলো। ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পূর্ণ ইতিবৃত্ত আজ পর্যন্ত যেমন লেখা হয় নি, তেমনি ভারতের বাইরে য়ুরোপে, আমেরিকায় ও জাপানে অবস্থান করে যে-সব ভারতীয় বিপ্লবীসন্তান মুক্তিসাধনার যজ্ঞে নিযুক্ত ছিলেন—তাঁদের কর্মপ্রয়াস অল্পবিস্তর লিপিবদ্ধ হলেও, আমার মনে হয় সে-সব বিবরণ আজ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে যে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি, তার ফলে অহিংসার উত্তাল প্লাবনের মুখে এদেশের ক্ষাত্রশক্তি একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল। আজ তাই আমরা

বিপ্লবীদের বন্দনায় ইতস্তত করি, তাঁদের কর্মপ্রয়াসকে কিছুটা লঘু করে দেখবার চেষ্টা করি। আমরা ভুলে যাই যে, গান্ধী ভারতব্যাপী একটা emotional integrity সৃষ্টি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কোনোদিনই জাতির অন্তরে একটা revolutionary urge জাগিয়ে তুলতে পারেন নি। ভারতে যাঁরা বিগত শতাব্দীর শেষে অথবা এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বিপ্লবের আয়োজন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটা বৃহত্তর অংশ ভারতের বাইরে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র রাসবিহারী বসু ভিন্ন আর কারো চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। অবশ্য দীর্ঘকাল জাপানে অবস্থান করে ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে তাদের মনোভাব জাগিয়ে তোলার যে সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, তেমন সুযোগ আর কেউ পান নি। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, সাভারকার, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীরা য়ুরোপে থেকে যা করতে পারেন নি, একা রাসবিহারী বসু জাপানে থেকে তাই করেছেন। তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা যথাস্থানে এই ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

নবীন তারুণ্যের প্রত্যূষে ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার রক্তিম অরুণোদয়ের স্বপ্নে আত্মহারা হয়ে, দুর্জয় সংকল্পে দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে যৌবনের প্রারম্ভে টিলক-অরবিন্দ-প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক সংঘে যোগদান করে দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতাকল্পে জীবনপণ করে রাসবিহারী বসু যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তা তিনি তাঁর সমস্ত জীবন-ব্যাপী একনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা যখন আসন্ন, তখন প্রবাসেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। দেশমাতার স্বাধীনতাকামী একনিষ্ঠ সন্তান হিসাবে, বিপ্লবী হিসাবে আজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তিনি যে সংগ্রাম করে গিয়েছেন তার

বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমি আমাদের জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি। এদেশের দুর্ভাগ্য, অন্যান্য বিপ্লবীদের মতো, রাসবিহারী বসুর আত্মদানের কথা, তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা জনসমাজে ঠিক তেমনভাবে প্রচারিত হয় নি, যেমনভাবে হওয়া উচিত ছিল। এক-একজনের কাছে এক-একজন 'হিরো' হয়ে আছেন এবং তাঁর দলীয় ভক্তবৃন্দের কাছে এইসব তথাকথিত 'হিরো'দের জৌলুষ যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা সত্যিই লজ্জাকর। একজনকে বড়ো করতে গিয়ে অন্যের কথা বেমালুম বিস্মৃত হওয়া অথবা অন্যের প্রয়াসকে লঘু করে দেখা—এটা আমাদের জাতিগত চরিত্রেরই একটা লজ্জাকর বৈশিষ্ট্য। রাসবিহারী বসু সম্পর্কে আমাদের অনাদর বা অবহেলার এটা একটা বিশেষ কারণ। অথচ আমরা দেখেছি যে, নেতা হয়ে তিনি তাঁর অবিসম্বাদী নেতৃত্বের গৌরব অতি সহজে আর একজনের হাতে তুলে দিতে পেরেছিলেন, তাঁর চরিত্র-মহিমা হৃদয় দিয়ে বুঝবার মতো। আজ যখন আমরা স্মরণ করি যে, আদর্শ স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী রাসবিহারী নিঃশেষে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নাম-যশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন, তখন আমরা বুঝতে পারি তাঁর মহত্ত্ব কোথায়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বত্যাগের মন্ত্রে তাঁর জীবনে যে-রকম সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল, তার মূল্যায়ন আজ প্রয়োজন। কারণ ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসে দ্বিতীয় রাসবিহারী বসু হিসাবে আমরা আর কাউকে পাই নি।

চার

রাসবিহারী বসুর বাল্য ও শৈশব জীবনের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। বর্ধমান জেলায় সুবলদ গ্রামে এক বসু-পরিবার বাস করতেন। এই পরিবারের বিনোদবিহারী বসু আমাদের বর্তমান আলোচনার নায়ক রাসবিহারী বসুর পিতা। তিনি সিমলায় ভারত সরকারের কোনো একটি বিভাগে কেরানির কাজ করতেন। তাঁর প্রথম সন্তান রাসবিহারীর জন্ম হয় ১৮৮৬ সনের মে মাসে হুগলী জেলার পালারা-বিঘাটি গ্রামে। এই গ্রাম ছিল রাসবিহারীর মাতুলালয়। জন্মের অল্পদিন পরেই তিনি মাতৃহীন হন; তখন তাঁর মাসীমা বামাসুন্দরী দেবী ঐ শিশুপুত্রকে আপন পুত্র-জ্ঞানে লালন-পালন করেন। এই বামাসুন্দরীকেই তিনি শৈশবাবধি ঠিক তাঁর মায়ের মতো জ্ঞান করতেন। পত্নীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে বিনোদবিহারী পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন এবং রাসবিহারীর বয়স যখন চার কি পাঁচ বছর তখন বিনোদবিহারী স্বগ্রাম সুবলদ পরিত্যাগ করে চন্দননগরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। রাসবিহারীর শৈশব-শিক্ষা এইখানেই হয়। তখনকার চন্দননগর একটি ফরাসী উপনিবেশ ছিল। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র যে দেশ থেকে উদ্গীত হয়েছে, ইতিহাসের একটি বিখ্যাত বিপ্লবের পীঠস্থান হিসাবে সমগ্র য়ুরোপে যে দেশটি এক স্বতন্ত্র গৌরবের অধিকারী, সেই ফরাসী দেশের সরকার শাসিত চন্দননগরের স্বাধীন পরিবেশে তাঁর শৈশবজীবন অতিবাহিত হয়েছিল এবং সম্ভবত এই কারণে বালক রাসবিহারীর মনে তখন থেকেই স্বাধীনতার স্পৃহা জেগেছিল।

শৈশবে যা বীজরূপে তাঁর চিত্তে উপ্ত হয়েছিল, কালক্রমে তাই-ই এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে এক অপূর্ব পরিণতি লাভ

করেছিল। চন্দননগরের স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে বাস করার ফলে যে স্ফুলিঙ্গটি এই বালকেব হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল, প্রকৃতি তাকে সযত্নে সকলের অলক্ষ্যে রক্ষা কবেছিল বলেই না তা নির্বাপিত হয় নি এবং বয়োঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই স্ফুলিঙ্গ রাসবিহারীর অন্তরে যে অগ্নিবলয়েব সৃষ্টি কবেছিল, ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য বিধান অনুসারে তাব আলোকচ্ছটা কিভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে দেদীপ্যমান করে তুলেছিল আর কিভাবেই বা তার দাহিকাশক্তি উত্তরকালে প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ভস্মীভূত করে দিয়েছিল, আমরা স্তবে স্তরে সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীর আবরণ উন্মোচন করব। রাসবিহারী যে একজন জন্ম-বিপ্লবী ছিলেন, সেটা তাঁর শৈশবজীবনের আচার-আচরণেই অভিব্যক্ত হতো। বিপ্লবের জয়টীকা ললাটে এঁকে দিয়েই বুঝি বিধাতা তাঁকে এই বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন; জন্মলগ্নে মায়ের কোলে তিনি বোধ হয় মঙ্গলশঙ্খেব ভেতর দিয়ে রুদ্রের বিষাণ শুনতে পেয়েছিলেন। "ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে, নহে সন্ধ্যার দীপালোক, নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ"—এই সঙ্গীত কবি বোধ হয় বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের উদ্দেশে করেই রচনা করেছিলেন। বিপ্লবী বাংলার শতাব্দীকালব্যাপী ঐতিহ্যের প্রসূতি-আগারেই জন্মগ্রহণ কবেছিলেন বাংলার অগ্নিযুগের যতীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, নরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবী সন্তানগণ।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি কথা বলব। মার্কসবাদী বহু লেখকের রচনায় বাংলা তথা ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে এই কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশের যুবকেরা তাদের সন্ত্রাসবাদী কাজে প্রেরণা লাভ করেছিল য়ুরোপের কয়েকটি দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অস্ত্রসাধনা বাংলার বিপ্লবীরা শুধু ইংরেজ আমলেই করেছে, বাংলার সত্যকার ইতিহাসে কিন্তু এর সমর্থন মেলে না।

বাংলার সামরিক ইতিহাস যাঁরা অবগত আছেন তাঁদের কাছে এ তথ্য স্বীকৃত যে, বাঙালী জন্মবিপ্লবী—বিপ্লবের চেতনা সুদূরকাল থেকেই তার রক্তে, তার অস্থিতে, তার মজ্জায় প্রবাহিত। অতীতের কয়েক শতাব্দীর দীর্ঘপথে সেই গৌরবময় ইতিহাস বিসর্পিত হয়ে আছে। "বাঙালী যে পূর্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।" —এই কথা লিখে গিয়েছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙালী কোনদিনই হীনবীর্য ছিল না; বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছে বারবার। কাজেই বাঙালীর বিপ্লব-প্রয়াসের প্রেরণা বাইরে থেকে অর্থাৎ য়ুরোপ থেকে আমদানী করা হয়েছে, এ উক্তি ভ্রান্তিজনক। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়ই জিজ্ঞাসা করি: "য়ুরোপ সভ্য কত দিন? আমাদের এই রেনেসাঁস কোথা হইতে? কোথা হইতে এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল?" বাংলার মাটিতেই যদি এ জিনিস না থাকবে, বাঙালীর মনের মধ্যে যদি অকুতোভয়তার ভাব পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত না থাকবে, তা'হলে সেই শক্তি, সেই বীর্যবত্তার এমন প্রচণ্ড প্রকাশ শুধু ড্যান ব্রিন বা ক্রপটকিনের বই পড়ে কতদূর সম্ভব হতো, সেটা বিশেষভাবে আমাদের প্রণিধানযোগ্য। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর জীবনটাই তো এর একটা অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁদের সময়ে আমরা যতদূর জানি, বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে গীতা, আনন্দমঠ আর বিবেকানন্দের অগ্নিস্রাবী বাণী। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ছিল প্রথম যুগের বিপ্লবীদের জীবন-মন্ত্র—বাংলা থেকে মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র থেকে পাঞ্জাব—ভারতের এই তিনটি প্রধান বিপ্লব-কেন্দ্রের সাধকগণ এই একটিমাত্র মন্ত্রেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, কার্ল মার্কসের মন্ত্রে নয়। এই একটি মাত্র মন্ত্রকে আশ্রয় করেই তাঁরা অস্ত্রসাধনার কণ্টক-সঙ্কীর্ণ পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন—লোকমান্য টিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লাজপত রায়, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবের গুরুস্থানীয় সকলেই

একবাক্যে এই কথা বলে গিয়েছেন। বিপ্লবীর জীবন গড়ে ওঠার উপায় ও উপাদান বলতে যা কিছু বোঝায় তার সবই ছিল এই দেশের শতাব্দীকালব্যাপী শক্তিসাধনার ঐতিহ্যের মধ্যে। আমরা যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিভিন্ন আন্দোলনের তরঙ্গ লক্ষ্য করি তা'হলে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয় যে, অতীতের গৌরবকে স্মরণ করেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তৎপরবর্তী ইংরেজ আমলে অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে জনমন যতই চঞ্চল, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে, ততই বাঙালী সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পদক্ষেপ করতে থাকে।

বিপ্লবীর জীবনচরিত সাধারণ মানুষের জীবনচরিত নয়। বাইরের ঘটনার চেয়ে তাঁদের মনের গতি-প্রকৃতিই অনুসরণ করা উচিত। সাধারণ মানুষের জীবন বলতে আমরা যা বুঝি সেটাকেই কবি "শুধু দিনযাপনের গ্লানি" বলে বর্ণনা করেছেন। বিপ্লবীরা কি ভাবতেন, কি ধরনের চিন্তা করতেন, কেমন ধারা আলোচনা চলত তাঁদের মধ্যে এবং তার থেকে কি সিদ্ধান্ত হতো—এঁদের জীবনচরিত আলোচনায় এইটাই মুখ্য, অন্যান্য বিষয় গৌণ মাত্র। রাসবিহারী বসু সম্পর্কেও এই সত্য প্রযোজ্য। যে-সব বিশেষ বিশেষ ঘটনার ভেতর দিয়ে তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের বিকাশ ও পরিণতি হয়েছিল, সেইগুলির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁর মনের কথা বা ধ্যানের কথা বিশেষভাবে বলবার চেষ্টা করব। বিপ্লবীকে বুঝতে হলে সকলের আগে মনে রাখতে হবে যে প্রথমে এঁরা স্বাধীনতা-পিপাসী, পরে তাঁরা অন্য কিছু। এঁদের কাছে ইংরেজ দেশের শত্রু ভিন্ন আর কিছু নয়—গান্ধীর মতো এঁরা ইংরেজকে কোনোদিনই বন্ধু বলে মানতে শেখেন নি। গান্ধী ও গান্ধী-অনুবর্তীদের কাছে বিশ্বমানবপ্রেমটা মুখ্য, কিন্তু বিপ্লবীদের কাছে ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাই মুখ্য বলে বিবেচিত হয়েছে চিরকাল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত দেখা যায় এই ধারা বলবৎ ছিল। রাসবিহারী

বসুকে শুধু একজন বিপ্লবী বলে মনে করলে ভুল হবে। আসলে তাঁর মধ্যে আমরা একটি বড়ো রকমের রাজনৈতিক প্রতিভার সন্ধান পাই। তেমন প্রতিভা এই দেশের বিপ্লবী সমাজে খুব বেশি আমরা পাই নি।

চন্দননগরের প্রথম যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ একজন। সম্পর্কে ইনি রাসবিহারীর মাসতুতো ভাই হতেন এবং বয়সে কিছু বড়ো হলেও ইনিই ছিলেন তাঁর শৈশবের সঙ্গী ও খেলার সাথী। উভয়ের মনের গঠনও ছিল একরকম। দু'জনে একই স্কুলে পড়াশুনা করতেন। উত্তরকালে এই শ্রীশচন্দ্রও বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ছেলেবেলায় রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র দু'জনে মিলে প্রায়ই গভীর রাত্রে গঙ্গার তীরে নির্জন শ্মশানঘাটে যেতেন। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এখানে এই শ্মশানে তাঁদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? কিসের আকর্ষণে তাঁরা এইখানে আসতেন? আসতেন তাঁরা মড়ার খুলির সন্ধানে। সেই খুলি সংগ্রহ করে তাঁরা বাড়ি নিয়ে আসতেন। এই বিচিত্র জিনিস ছিল তাঁদের খেলার সামগ্রী। ভবিষ্যতে যাঁর নাম ইংরেজ শাসকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করবে, সেই বালক কি আজ শব-সাধনায় আকৃষ্ট হলেন? অত রাত্রিতে বাড়ি ফিরতে দেখে একদিন তাঁর মাসীমা রাসবিহারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে রাসু, তোরা দু'জনে রোজ রোজ অত রাত্রে কোথা থেকে ফিরিস বল্ তো?

—শ্মশানঘাট থেকে, মাসীমা।

শ্মশানঘাট! শুনে বামাসুন্দরী দেবী যারপরনাই বিস্মিত হন। সেখানে কি জন্য যায় এরা? কৌতূহল জাগে তাঁর মনে। আবার জিজ্ঞাসা করেন, সেখানে কি জন্যে যাস তোরা?

—মড়ার খুলি আনতে। সরল মনে স্বীকার করেন রাসবিহারী। এই কথা শুনে মাসীমার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

হিন্দুর ছেলে, শ্মশানে গিয়ে মড়ার খুলি সংগ্রহ করে—এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে, না এমন কাণ্ড কেউ কখনো দেখেছে? লোকে জানলেই বা কি বলবে? মাসীমার সঙ্গে ভিতর বাড়িতে রাসবিহারীর যখন কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন বাইরে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। বাড়ির পেছন দিকে একটা উঠান ছিল। সেই উঠানের এক নিভৃত কোণে গর্ত খুঁড়ে মাটির মধ্যে শ্মশান থেকে সংগৃহীত পাঁচটি মড়ার খুলি পুঁতে রেখেছিলেন শ্রীশচন্দ্র আর রাসবিহারী। কেউ এটা জানত না। সেদিন হয়েছে কি, পাশের বাড়ির উঠানে একটা মড়ার খুলি পাওয়া গিয়েছে। শিয়ালে কোথা থেকে এনে ফেলেছে। শ্মশান তো অনেক দূরে, তবে এ জিনিস এলো কোথা থেকে? তারপর জানা যায় যে, বোসেদের বাড়ির উঠানের গর্ত খুঁড়ে শিয়াল ঐ মড়ার খুলি এই বাড়িতে এনে ফেলেছে। এই নিয়ে পাড়ায় একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। তখন লোকজন এসে ঐ বাড়ির উঠান খুঁড়ে আরো কয়েকটা মড়ার খুলি আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়। রাসবিহারীর মেসোমশাইকে তারা এই কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল সেদিন সকালবেলায়। তিনি এর বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। এবং তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন নি যে তাঁর বাড়ির ছেলেই এমন কাণ্ড করে বসেছে। তিনিও ঠিক সেই সময়ে ভিতরে এসে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সব কথা জানতে পারলেন। তখন সেখানে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে বালক রাসবিহারী। তাঁর মুখে কোনো কথা নেই। মেসোমশাইকে বালক অত্যন্ত ভয় করতেন। তিনি কিন্তু কিছু বললেন না, ভর্ৎসনাও করলেন না। যেমন এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন এবং বাইরে এসে বললেন, রাসু আর শ্রীশ দু'জনে মিলে একটা পঞ্চমুণ্ডির আসন করবে বলে শ্মশান থেকে এই মড়ার খুলি জোগাড় করেছে। বুঝুন আপনারা ব্যাপারখানা, তাদের মাথায় এই বয়সে কি রকম পাগলামি ঢুকেছে।

তখন রাসবিহারীর বয়স সবে চৌদ্দ পূর্ণ হয়েছে—এবং বাংলার বর্ণাঢ্য উনিশ শতকের অন্তিম প্রহর তখন সবে মাত্র বিঘোষিত হয়েছে। সেই বয়সেই তিনি আর শ্রীশচন্দ্র ছু'জনে মিলে 'আনন্দমঠ' পড়ে শেষ করেছেন। রাসবিহারী স্বয়ং উত্তরকালে তাঁর বিপ্লবীজীবনের অন্যতম সতীর্থ উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একবার বলেছিলেন যে, তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার আগে কমপক্ষে বিশবার 'আনন্দমঠ' পড়ে শেষ করেছিলেন। শুধু নিজে পড়া নয়, তাঁর স্কুলের অনেক সহপাঠীদেরও জোর করে ঐ বই পড়িয়েছিলেন। রাসবিহারীর প্রসঙ্গে অমরদার কাছে লেখক এই কথা শুনেছিলেন এবং প্রবর্তক সংঘের মতিলাল রায়ও একবার লেখককে বলেছিলেন যে, চন্দননগরের বিপ্লবীদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আনন্দমঠের উৎসাহী প্রচারক ছিলেন রাসবিহারী বসু। প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা অবধি এ বই তাঁর মুখস্থ ছিল। শুধু মুখস্থ ছিল বললে কম বলা হয়, রাসবিহারী ছিলেন যেন বঙ্কিমের আনন্দমঠেরই সর্বত্যাগী সন্তান—আচারে-আচরণে এবং মানসিকতায়। আনন্দমঠের পর নবীন সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যখানিও তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এই কাব্যখানি থেকেও রাসবিহারী তাঁর বিপ্লবীজীবনের অনেক প্রেরণা লাভ করেছিলেন—এ তাঁর নিজেরই কথা।

রাসবিহারীর জন্মের ঠিক চার বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল যুগান্তকারী গ্রন্থ 'আনন্দমঠ'। প্রকাশিত হওয়ার ছুই দশকের মধ্যেই এই উপন্যাসে পরিবেশিত দেশপ্রেমের আদর্শ বাংলার বিপ্লবীসন্তানদের চিত্তে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বস্তুত ভবিষ্যৎ ইতিহাসের আগমনী সুস্পষ্টভাবেই ঝঙ্কৃত হয়েছিল এই গ্রন্থে। সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বে আগমনী থাকে। উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বাংলা দেশে যে বিপ্লববাদ জন্মগ্রহণ করেছিল তারই আগমনী রচনা করে গিয়েছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙালীর

জাতীয় জীবন সংগঠনে 'আনন্দমঠে'র স্থান কতো উচ্চ ও গভীর তা নিয়ে আজ আর বিতর্কের অবকাশ নেই। সেদিন বিংশ শতকের উষাকালে স্বদেশকর্মীদের এক হাতে ছিল গীতা ও অন্য হাতে আনন্দমঠ। আনন্দমঠের ভিতরকাব ভাবব্যঞ্জনা তথা সন্ন্যাসী সন্তান-সম্প্রদায়ের নিষ্কাম স্বদেশপ্রেম বাংলার বিপ্লবী যুবকদের প্রাণে স্বদেশভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ত্যাগ, দুঃখবরণ ও সেবা-ধর্মের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল। জাতীয় জীবন গঠনে এই উপন্যাসখানির কৃতিত্ব অসাধারণ। মাতৃভূমির মুক্তিসাধনের উপায় নূতন যুগে যে নব নব রূপ পরিগ্রহ করে থাকে এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আর কেউ বোঝাতে পারেন নি।

এই প্রসঙ্গে 'নবযুগের বাংলা' গ্রন্থে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই লিখেছেন : "বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির আদর্শে কোনও প্রকারের সংকীর্ণতা ছিল না ; থাকিলে এই স্বদেশপ্রীতির উপরে তিনি লোকশ্রেয়ের এবং লোকশ্রেয়ের উপরে তাঁহার নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। আনন্দমঠে তিনি দেশ-মাতৃকাকে মহাবিষ্ণুর বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্ব-মানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। মহাবিষ্ণুকে বা নারায়ণকে বা বিশ্বমানবকে ছাড়িয়া দেশ-মাতৃকার পূজা হয় না। এ কথাটা আনন্দমঠের একটা প্রধান কথা।"

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, তাঁর বয়স যখন চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয় তখন রাসবিহারী 'আনন্দমঠ' পড়ে শেষ করেছেন। শুধু পড়া নয়, এই উপন্যাসে বর্ণিত স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান সেই বয়সেই তাঁর কিশোরচিত্তকে কি রকম উদ্বেলিত করে তুলেছিল তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। কল্পনা করতে পারি যে একদিন সন্ধ্যায় চন্দননগরে গঙ্গার তীরে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে রাসবিহারী

তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন—আচ্ছা শ্রীশদা, তুমি তো আনন্দমঠ পড়েছ। এর কোন্ জায়গাটা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে? শ্রীশচন্দ্র একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, তোমার মতো অমন মনোযোগ দিয়ে তো আমি পড়ি নি।

—বইয়ের উপক্রমণিকাটা মনে নেই? মনে নেই—"সেই অনন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?

"শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?

"এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, তোমার পণ কি?

"প্রত্যুত্তরে বলিল, পণ আমার জীবনসর্বস্ব।

"প্রতিশব্দ হইল, জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

"আর কি আছে? আর কি দিব?

"তখন উত্তর হইল, ভক্তি।"

আমরা আরো কল্পনা করতে পারি যে, সেদিন চন্দননগরে গঙ্গার তীরে সন্ধ্যার সেই নিস্তব্ধ প্রহরে এই যে দু'জন বাঙালী কিশোর আনন্দমঠের ভাবে ভাবিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তা কি নিরর্থক ছিল? তা কি শুধু কৈশোরের আবেগ ছিল? সেই দুই কিশোরের চিত্ত মথিত করে কি প্রশ্ন জাগে নি—তোমার পণ কি? উত্তরে কি তাঁরা বলেন নি—পণ আমাদের জীবনসর্বস্ব। আবার কি প্রশ্ন জাগে নি—জীবন তুচ্ছ, আর কি দেওয়া যায়? তেমনি আবার কি উত্তর মেলে নি—ভক্তি। নিজের জীবনকে যিনি একদিন এই

ভক্তির শ্বেত শতদলরূপে দেশজননীর চরণে নিবেদন করে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, সেই রাসবিহারী বসুকে আমরা সত্যিই আমন্দমঠের সন্তানরূপে কল্পনা করতে পারি। তাঁর বহু রচনার মধ্যে আমরা এর সমর্থন পাই। সেই কিশোর বয়সেই আনন্দমঠের আদর্শ, স্বদেশ-সেবার জন্য কেবল জীবনদানই সব নয়— রাসবিহারী যে তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন, সেটা তাঁর পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপই সমর্থন করে। ভগিনী নিবেদিতা যেমন ছিলেন 'জীবন্ত বেদান্তা', রাসবিহারী তেমনই ছিলেন 'জীবন্ত আনন্দমঠ'—এই কথা শুনেছি তাঁরই অন্যতম সতীর্থ অমরেন্দ্রনাথ্ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে।

আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়েছে। এর তিন বছর পরে স্থাপিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হতে শুরু করেছে দেশের আকাশ-বাতাস। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধেরও উদ্বোধন হয়ে গেছে শতাব্দীর সেই ক্রান্তিলগ্নে। এমন কি সুদূর মহারাষ্ট্রে পুণার প্লেগ উপলক্ষ্য করে দামোদর ও চাপেকার নামক দুইজন মারাঠী-যুবকের রিভলবারের গুলিতে সশস্ত্র বিপ্লবের আগমনীও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। আর সেই একই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে নব-জাগরণ-যজ্ঞের নূতন ঋকও উচ্চারিত হতে আরম্ভ করেছে। ঠিক এই সময়েই চন্দননগরের মাটিতে এক সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসারে বাঙলা তথা ভারতের আগামী দিনের বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ধীরে ধীরে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে যাপন করছিলেন। শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় যে তাঁর জীবনের উদয়াচলে বিপ্লবের রক্তরাঙা সূর্য উদিত হতে আরম্ভ করেছে।

পাঁচ

—আজ সুরেন বাঁড়ুজ্যের মিটিং হবে বিকেলবেলায়, যাবি ?

—কোথায় মিটিং ?

—চুঁচড়োয়।

—মেসোমশাই যদি বলেন তবে যাব, নইলে কতো রাত হবে ফিরতে, তিনি তখন বকাবকি করবেন। মাসীমাও কি বলবেন।

—তা'হলে তুই যাবি না ?

—যাব না, তা নয়। যাওয়া তো উচিত। শুনেছি তাঁর বক্তৃতা তো সাধারণ মানুষের বক্তৃতা নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরে থাকে ঝড়ের মাতন, উচ্চারিত কথায় থাকে মেঘের গর্জন।

—তা'হলে আজ আমাদের স্কুল কামাই করতে হয়।

—তা করা যাবে। কিন্তু হেডমাস্টার মশাই জানতে পারলে কি বলবেন।

—বলব পেটের অসুখ করেছিল।

—না, মিথ্যাকথা বলতে পারব না। বলব সুরেন বাঁড়ুজ্যের লেকচার শুনতে চুঁচড়ো গিয়েছিলাম।

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা। একদিন শ্রীশচন্দ্র আর রাসবিহারীর মধ্যে এই রকম কথাবার্তা হচ্ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্কার বেগে সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করে দিনের পর দিন বক্তৃতা করে বেড়াতেন। ভাবীকালের বহু বিপ্লবী সন্তান তাঁদের জীবনের প্রথম বয়সে সেই হৃদয়-মাতানো বক্তৃতা শুনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেদিন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের বিদ্রোহী আত্মার বাঙ্ময় প্রকাশ আমরা যেন তাঁরই কম্বুকণ্ঠকে আশ্রয় করে লক্ষ্য করেছি। এখানে

রাষ্ট্রগুরুর কথা সংক্ষেপে একটু বলব। বাঘা যতীন, রাসবিহারী বসু, নরেন ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালের মানবেন্দ্রনাথ রায়), হেমচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের কথা আজকালকার ছেলেরা যেমন জানে না, তেমনি তাদের কাছে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় একরকম অপরিজ্ঞাত বললেই হয়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে যুগটা অহিংসা বা খদ্দর-চরকার যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে, সেই যুগের যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের অনেকের প্রতিই সুবিচার করেন নি। এরই ফলে গোখলে যেমন বিস্মৃত ও অবহেলিত হয়েছেন, সুরেন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর স্বজাতির কাছে বহুল পরিমাণে উপেক্ষিত ও অনাদৃত হয়েছেন।

নবীন ভারতের দীক্ষাগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৯২৫) প্রথম জীবনে ছিলেন একজন সিবিলিয়ান। তারপর ঘটনাচক্রে সেই সিবিল সার্ভিসের সোনার শেকল কেটে বেরিয়ে এসে তিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন আবর্তসংকুল রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে। সে আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন তিনিই। জাতীয়তার সঞ্জীবন মন্ত্র প্রচার এবং দেশাত্মবোধের উদ্দীপন ও পরিব্যাপ্তিসাধন, ইতিহাসে এই ছিল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা। তাঁর কণ্ঠে ছিল সিংহনাদ, লেখনীতে শাণিত যুক্তি। ইলবার্ট বিল বা ম্যাকেঞ্জি বিল আন্দোলনের সময়, বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশীর সময়—তাঁর ঐ সিংহনাদে কে না মুগ্ধ হয়েছে? স্বায়ত্তশাসন, মুক্তি বা স্বাধীনতা—এসব কথা যখন কেউ জানত না, তখন গুরুরূপে সুরেন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতার বাণী নিয়ে এসেছিলেন এই দেশে। তাঁর সমগ্র জীবন-কথা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, রাজা রামমোহন রায় যেমন বর্তমান ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তির পথপ্রদর্শক ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথও তেমনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক। এই দেশহিতৈষী সম্পর্কে শুধু এইটুকু বললেই

যথেষ্ট হবে যে, "নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চক্ষে নব্যযুগের বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অভিব্যক্তিতে সুরেন্দ্রনাথের একটা অনন্যলব্ধ বিশিষ্ট স্থান আছে।" এদেশে ছাত্রসভা বা Students' Association গঠনের পুরোধা ছিলেন তিনি, যেমন তিনি পুরোধা ছিলেন ভারত সভা বা Indian Association গঠনের ক্ষেত্রে। জীবনের অর্ধশতাব্দীকাল অর্থাৎ ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ সন পর্যন্ত তিনি নিজেকে অক্লান্তভাবে এই দেশের মুক্তি আন্দোলনের কর্মে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একটি মানুষ তাঁর দেশ ও জাতিকে কি অবস্থা থেকে কি অবস্থায় দাঁড় করিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস যেদিন ঠিকমতো রচিত হবে সেদিন জানা যাবে যে ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের সর্বপ্রধান পুরোহিতের সম্মান একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য, আর কারো নয়।

কলিকাতার হিন্দু স্কুলে ছাত্রসভার প্রথম সভায় যেদিন তিনি ভারতে শিখশক্তির অভ্যুত্থান সম্পর্কে বক্তৃতা দেন সেইদিনই তাঁর স্বজাতি তাঁকে নেতৃত্বের পদে বরণ করেছিল। মুষ্টিমেয় শিখসেনা কি ভাবে ভারত-বিজয়ী ইংরেজকে পরাস্ত করেছিল, শিখের ইতিহাসে সেইটাই হলো আসল কথা। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বড়ো একটা তাদের কথা বলতেন না। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার মাধ্যমেই প্রথম বাংলার যুবসমাজ জানতে পারল যে, পঞ্চনদের তীরে গুরু তেগবাহাদুর ও গুরুগোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে নবীন শিখজাতির যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তার অন্তরালে ছিল একটা স্বজাতিবাৎসল্যের প্রতিষ্ঠার দুর্জয় সংকল্প। সেদিন বাংলা দেশের প্রত্যেকটি ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার মধ্যে শিখের অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই থাকত এবং তাঁরই মুখে ভারতে শিখশক্তির অভ্যুদয়ের একটা নূতন ব্যাখ্যা শুনে ভাবীকালের বহু বিপ্লবী তাঁদের জীবনের প্রারম্ভে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। রাসবিহারী বসুর অন্যতম সতীর্থ, শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে লেখক স্বয়ং এই কথা বহুবার শুনেছেন।

সেদিন চুঁচুড়ার ময়দানে হাজার হাজার শ্রোতার সামনে সুরেন্দ্রনাথ শিখজাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা যখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাগ্‌বৈভবের সঙ্গে তাদের শোনালেন, তখন সেই অসংখ্য কিশোর শ্রোতার মধ্যে রাসবিহারীর মনের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। সকলের অলক্ষ্যে তাঁর মনে স্বাধীনতার স্পৃহা কতটুকু জেগেছিল, সেটাও আমরা আজ অনুমান করতে পারি। দেশধর্ম বা দেশচর্যার বীজ সেদিন কিশোরের উর্বর অন্তঃকরণে নিশ্চয়ই উপ্ত হয়েছিল। শিখের ইতিহাসকে উপলক্ষ্য করে রাষ্ট্রগুরু সুবেন্দ্রনাথ দেশের তরুণচিত্তে যে বৈপ্লবিক চিন্তা সেদিন সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ তো হয়-ই নি, বরং তা ছিল সুদূরপ্রসারী। রাজশক্তির প্রতিকূলে একটা বিদ্রোহের ভাব তিনি কৌশলে এইভাবেই সেদিন দেশের তরুণদের মনে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেব অন্যতম জনক হলেও, নব-যুগের বাঙলায় রাষ্ট্রীয় সাধনার যে আয়োজন সেদিন তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তী কালের বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর তার প্রভাব যে কিছুটা গিয়ে পড়েছিল, এ কথা আমরা বিতর্কের কোনো আশঙ্কা না বেখেই বলতে পাবি। সেদিন তিনিই তো ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির স্বদেশপ্রেম ও নির্ভীকতার কথা ছাত্রদের কাছে সর্বপ্রথম তুলে ধবেছিলেন। বাংলাব তরুণদের সঙ্গে তিনিই ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির পরিচয় সাধন কবিয়ে দিয়ে, এদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ কতদূর প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন, সেটা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ অনেক বিপ্লবী নেতার মুখে লেখক শুনেছেন। “আমাদের সময়ে কে গ্যারিবল্ডি হবেন, এই নিয়ে একটা তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত একসময়ে। কেন না আমরা তখনই ঠিক বুঝেছিলাম যে, বিপ্লব আন্দোলনে একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি গ্যারিবল্ডির মতো একজন সেনাপতিরও প্রয়োজন আছে।

আমরা তখন রাষ্ট্রনেতা বলতে বুঝতাম টিলককে আর সেনাপতি বলতে বুঝতাম যতীনদাকে (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ।"—এই কথা বলে গেছেন স্বয়ং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সুরেন্দ্রনাথ চুঁচুড়ায় আসবেন, বক্তৃতা দেবেন, তা কি রাসবিহারী না শুনে পারেন? স্কুলের আরো কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে চন্দননগর থেকে দলবেঁধে তাঁরা গিয়েছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা শুনতে। এই দলের নেতা ছিলেন চন্দননগরের স্বনামধন্য চারু রায়। তখনকার দিনে অভিভাবক বা স্কুলের হেডমাস্টারের বিনা অনুমতিতে তাঁর সভায় যোগদান করা বা তাঁর বক্তৃতা শোনা স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে একরূপ নিষিদ্ধ ছিল। রাসবিহারী এমনিতে শান্তশিষ্ট ও নম্র প্রকৃতির হলেও এই জাতীয় নিষেধ শোনার মতো ছেলে যে তিনি আদৌ ছিলেন না, তা আমরা অনুমান করতে পারি। বিপ্লবীর পথ আমৃত্যু দুঃখের পথ, দুঃখ-সাধনার পথ—এই সত্য কি সেই বয়সেই তাঁর উপলব্ধির সীমার মধ্যে এসে গিয়েছিল? হয়ত এসেছিল।

মিটিং থেকে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হলো। এত রাত যে হবে সেটা শ্রীশচন্দ্র বা রাসবিহারী কারোই জানা ছিল না। এতটা পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং পায়ে হেঁটে ফিরে আসা—রাত হবারই কথা। পথে আসতে আসতে দুইজনের মধ্যে বক্তৃতার বিষয় নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল। মানুষের মুখের উচ্চারিত কথার মধ্যে যে বিদ্যুতের এমন শক্তি থাকতে পারে, সে অভিজ্ঞতা রাসবিহারীর জীবনে সেই প্রথম। সেদিনের তরুণ শ্রোতাদের মধ্যে আরো একজন ছিলেন। তিনি রাসবিহারীর অন্যতম সতীর্থ চন্দননগরের স্বনামধন্য মতিলাল রায়। এই গ্রন্থের লেখক যখন এক-সময়ে প্রবর্তক সংঘের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন একদিন কথাপ্রসঙ্গে সংঘ-নেতা তাঁদের কৈশোরজীবনের এই স্মৃতির

কথা উল্লেখ করে লেখককে বলেছিলেন—"সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের সেই বয়সে সুরেন্দ্রনাথের কম্বুকণ্ঠনিঃসৃত ওজস্বিনী বক্তৃতা যেন আমাদের সবাইকে তাতিয়ে-মাতিয়ে দিয়েছিল। সেই বক্তৃতা শুনবার পর থেকেই তো আমাদের চন্দননগরের আড্ডায় (তখন প্রবর্তক-সংঘ গড়ে উঠে নি, তখন ছিল চারুচন্দ্র রায়ের 'সুহৃদ সম্মিলনী' এবং এখানকার ভাবী বিপ্লবীদের এইটাই ছিল মিলন-কেন্দ্র।) দেশ-বিদেশের বৈপ্লবিক ইতিহাসের কাহিনী পড়বার উৎসাহ পড়ে গেল। গ্যারিবল্ডি-ম্যাটসিনির বৈপ্লবিক চেতনা আমাদের মধ্যে সুতীব্রভাবেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। দেশমাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামে কে আগে প্রাণদান করবে, সেই নিয়ে যেন আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল।"

চন্দননগরের এই সুহৃদ সম্মিলনী ও এর প্রতিষ্ঠাতার কথা এখানে কিছু বলা দরকার। সে-যুগের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও স্বনামধন্য অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই ছিলেন চন্দননগরের রাষ্ট্রগুরু। আলিপুর বোমার মামলায় বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইয়ের অন্যতম হত্যাকারী কানাইলাল দত্তের গৃহশিক্ষক ছিলেন তিনি। ঐ মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো অনেকের সঙ্গে চারুবাবু ধৃত হন। তাঁকে চন্দননগর থেকে ধরে আনা হয়। আন্তর্জাতিক আইনের কল্যাণে তিনি ফরাসী প্রজা বলে রেহাই পান। এঁরই সংস্পর্শে এসে রাসবিহারী, শ্রীশচন্দ্র, মতিলাল রায় প্রমুখ তরুণেরা অগ্নিমন্ত্রে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইনিই ছিলেন স্থানীয় বিপ্লবী যুবকদের পথপ্রদর্শক। সেদিন ঐ সুহৃদ সম্মিলনীর অন্তরালে ধীরে ধীরে তিনি যে আখড়াটি গড়ে তুলেছিলেন, সেই আখড়াটি যে অদূর ভবিষ্যতে বিপ্লবের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে তা অনেকে হয়ত কল্পনা করতে পারেন নি। শুনতে পাওয়া যায়

বাংলাদেশে প্রথম গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। কিন্তু তাঁরা কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। না পারুন তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তাঁরা যে আগমনী গেয়ে যেতে পেরেছিলেন এবং বিপ্লবের ভাবটা অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে ideas and idealism—সেটা যে তাঁরা প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন, তাই তো কয়েক দশকের মধ্যেই একটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই রকম অনেক সমিতি গড়ে উঠেছিল, যেমন কলিকাতায় আত্মোন্নতি সমিতি, বরিশালের বান্ধব সমিতি, মৈমনসিংহের সাধনা সমিতি, ফরিদ-পুরের ব্রতী সমিতি। সেইরকম চন্দননগরে ছিল সুহৃদ সম্মিলনী। অনু-শীলন সমিতির দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা লাভ করেই যে এইসব সমিতি স্থাপিত হতো, তা বলা বাহুল্য। অনুশীলন সমিতির সূচনা, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস যেমন দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের নবযুগের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তেমনি মফঃস্বলের অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত এই সমিতিগুলিরও উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাসও বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বাংলার ভবিষ্যৎ বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেরই সেদিন হাতেখড়ি হয়েছিল এইসব সমিতির মধ্যে। এখানে কত স্বপ্ন, কত ভাবাদর্শের মোহনীয় স্পর্শ, কত আবেগময় মুহূর্ত এঁদের জীবনের পাত্র পূর্ণ করে দিত নূতন-দিন-আনার নবীন উৎসাহের প্রবাহে। এখান থেকেই তাঁরা আহরণ করেছিলেন প্রাণ-সন্দীপনী কর্মতৎপরতার মন্ত্র। শিখেছিলেন তাঁরা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর শৃঙ্খলা। কড়া চাবুকের শাসনের মতো কঠিন নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হতো এইসব সমিতির সভ্যদের। অনেক স্থলেই এই সমিতিগুলির বাইরের চেহারাটা ছিল অন্য রকমের, দেখলে মনে হবে যেন নিরীহ একটি সেবা-সমিতি। অবশ্য

স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শটা এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালকেরা একেবারে বাদ দেন নি। এঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, এই দেশে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন এই সন্ন্যাসী।

সুহৃদ সম্মিলনীতে একদিন বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে চারু রায় তরুণ সভ্যদের একটা কথা বলেছিলেন: "আমরা দেশজননীর মূর্তি গড়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের ছাঁচে, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছি বিবেকানন্দের অগ্নিমন্ত্রে।" সুন্দর কথা। এই কথাটি সেদিন রাসবিহারীর কিশোর চিত্তে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের মতো। চারুবাবু বলতেন, তাঁদের মধ্যে বাঘা যতীনেরই কিছু সৌভাগ্য হয়েছিল স্বামীজির সঙ্গে মেলামেশা করার। বাংলার অনুশীলন সমিতিকে তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। একটা অবসন্ন ও হীনবীর্য জাতিকে নূতন চেতনমন্ত্রে যেন জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন এই সন্ন্যাসী। আর একদিন চারুবাবু যখন সুহৃদ-সন্তানদের (এই সমিতির সভ্যদের এই নামে ডাকা হতো) কাছে বললেন—"নিজের জীবনেই তিনি ভারতে বিপ্লব দেখে যাবেন এমন কথাও তাঁর মুখে কেউ কেউ শুনেছিলেন। পতিত, পর-পদানত, ইংরেজের জুতোর ঠোক্কর খাওয়া এই জাতটাকে তিনি যে কত উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন, সেটা ভাবলে পরেই মনে হবে যে, এই সন্ন্যাসীর জীবন ও জীবন-চিন্তা যেন অবসন্ন জাতির মধ্যে তেজ ও আলো, বীর্য ও আশা—দুই-ই এনে দিয়েছিল।"

দেশ, দেশ, আমাদের এই দেশ।

একেই আমাদের বড়ো করতে হবে। স্বাধীন করতে হবে।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে, কে পরিবে পায়?

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥
স্বদেশের ধূলি, স্বর্ণরেণু বলি রেখো রেখো হৃদে—এই ধ্রুবজ্ঞান।
ইত্থং যদা যদা হি বাধা, দানবোত্থা ভবিষ্যতি,
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যবিসংক্ষয়ম্।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি—
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

সুহৃদ সম্মিলনীর তরুণ সভ্যরা যখন প্রজ্জলিত হোমাগ্নির সামনে বসে তাদের নেতা চারুচন্দ্র রায়েব মুখে এইসব উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনতেন, তখন তাঁদের দেহের সমস্ত শিবা-উপশিরায় খেলে যেত বিদ্যুতের শিহরণ। এইসব ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া ছেলের দলই পরবর্তীকালে দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে একের পর এক যে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড সৃষ্টি করে বিদেশী শাসকদের চমক লাগিয়ে দিয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তো আজো বিরচিত হয় নি।

সুহৃদ সম্মিলনীতে বাছা বাছা বইয়ের একটি সুন্দর লাইব্রেরী ছিল। পববর্তীকালে এই সমিতি যখন উঠে যায় তখন এর পুস্তক-সংগ্রহ প্রবর্তক সংঘের পাঠাগারে স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আলোচনা বৈঠক বসত। যে বিষয়ে রবিবার আলোচনা হতো, কিশোরদের সেই বিষয়ে আবশ্যকীয় বইয়ের নাম বলে দেওয়া হতো। সভ্যরা বইগুলি বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়তেন। তাছাড়া তাঁরা পড়লেন কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হতো। যেখানে কঠিন মনে হতো, চারুবাবু সেখানটা তাদের বুঝিয়ে দিতেন। ভালো ভালো জায়গাগুলি টুকে রাখতে বলা হতো। এছাড়া, সম্মিলনীর একটা মর‍্যাল ক্লাস ছিল। এটা শেষে ফুটে উঠেছিল ট্রেনিং ক্লাসে। অনুশীলন সমিতির আদর্শেই এই সমিতিটি গঠিত হয়েছিল। রোগীর সেবা, মৃতের সৎকার, শহরের বিভিন্ন অঞ্চল

থেকে সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর কাজের ভেতর দিয়ে সভ্যদের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশ সাধন করা হতো। সম্মিলনীর পেছনের বাগানে ছিল একটি আখড়া। এখানে সভ্যদের তলোয়ার, লাঠি, ছোরা, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি ও ড্রিল শিক্ষা দেওয়া হতো। এইভাবে শক্তিচর্চার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হতো। সভ্যদের মধ্যে রাসবিহারীর দেহ ছিল সবচেয়ে সুগঠিত, একেবারে পালোয়ানের শরীর। তাঁর রং ছিল কটা; হাতের পেশী ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। বাঘা যতীনের শরীরে যেমন প্রভূত শক্তি ছিল, রাসবিহারীও তেমনি প্রভূত শক্তির অধিকারী ছিলেন। লাঠি ও ছোরা খেলায় তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, রিভলবার চালনাতেও তেমনি দক্ষ ছিলেন! মনের শক্তিও ছিল তাঁর অসাধারণ। দেহে ও মনে তিনি যেন একটি বিকশিত ব্যক্তিত্বের সজীব প্রতিমূর্তি ছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালের মুখে শুনেছি যে, মাঝে মাঝে তাঁর পিতৃদেবও কলিকাতা থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে চন্দননগরে এসে সুহৃদ সম্মিলনীতে আসতেন ও সভ্যদের মনুষ্যজীবনে কি করা উচিত, সে বিষয়ে অনেক সদুপদেশ দিতেন। দেশ বলতে কি বুঝতে হবে, দেশের উন্নতি বলতে ঠিক কি বোঝায়, সংঘবদ্ধ জীবন কেন এবং জীবনে কি আহরণ করতে হবে—এসব বুঝিয়ে বলতেন বিপিনচন্দ্র। রাষ্ট্রনীতির কথাও তিনি আলোচনা করতেন। মতিলাল রায়ের মুখে শুনেছি যে, কলিকাতা থেকে আরো দু'জনকে মাঝে মাঝে এখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হতো। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (তখন তিনি ব্যারিস্টার সি. আর. দাস—এই নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।) আর অন্যজন সখারাম গণেশ দেউস্কর। দেশবন্ধু প্রধানত রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন আর দেউস্কর বলতেন অর্থনীতির কথা, ইতিহাসের কথা। তাঁর 'দেশের কথা' বইখানি তখন সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন; সেই নিষিদ্ধ পুস্তকই গীতার

পাশে স্থান পেয়েছিল এখানকার পাঠাগারে। তাঁদের মুখ থেকে যে-সব ভাবধারা নির্গত হতো, সম্মিলনীর কিশোর সভ্যদের প্রাণে তা' তুমুল প্রেরণার সঞ্চার করেছিল সেদিন।

একদিন সবাইকে গৃহত্যাগ করতে হবেই। সেজন্য বেছে বেছে সভ্যদের এখানে মাঝে মাঝে রাত্রিবাস করানো হতো। এইভাবে একত্র বাসের ভেতর দিয়ে তাঁরা মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও অনুকম্পার প্রথম পাঠ গ্রহণ করতেন। সম্মিলনীর দু'টি বিভাগ ছিল—একটি আভ্যন্তরীণ বিভাগ আর অপরটি বাইরের। আভ্যন্তরীণ বিভাগটিই আসল, কারণ এইটিই ছিল গুপ্ত-চক্র। যাঁরা সাধারণ সভ্য তাঁরা এটির সংবাদ জানতেন না। বাছাই করা ছেলেদের আভ্যন্তরীণ বিভাগ বা inner circle-এর মধ্যে স্থান দেওয়া হতো। রাসবিহারী, মতিলাল রায় প্রভৃতি বিপ্লবীরা আভ্যন্তরীণ বিভাগের সদস্য ছিলেন। সুহৃদ সম্মিলনীর inner circle-এর সভ্যদের মধ্যমণি ছিলেন রাসবিহারী। এই বিভাগের সভ্যদের তিনটি অঙ্গীকার করতে হতো—বিপ্লবীজীবনে দারিদ্র্য-ব্রত, ব্রহ্মচর্য, অবিবাহিত জীবন বা সংসারের ভারমুক্ত জীবন। দারিদ্র্য-ব্রতের অর্থ এই নয় যে, তাঁরা পরের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল হবেন। উপার্জন করতে হবে, উপার্জন করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আয়ত্ত করতে হবে, তবে স্বোপার্জিত অর্থের বেশির ভাগই নিজের জন্য খরচ না করে, বৈপ্লবিক কাজের জন্য খরচ করতে হবে। চরম আত্মদানের কাজে বিবাহিতরা সাধারণতঃ অপটু হয়, তাই সেদিন এই কাজের জন্য যাঁরা চিহ্নিত হতেন, তাঁদের পক্ষে দারপরিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল।

এইভাবেই সেদিন বাংলায় বিপ্লবের একটা ব্যাপক প্রস্তুতি চলেছিল সকলের অলক্ষ্যে। সমিতি ও সম্মিলনীতে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ—এইগুলিই যে বিপ্লবের মধুচক্র ছিল, সেটা পরবর্তীকালে জানা গিয়েছিল। নিঃশব্দে ও সকলের অগোচরে সেদিন ভয়ঙ্করের ভয়-ভাঙার

যে সাধনা চলেছিল বাংলার একদল বেহিসাবী তরুণদের মধ্যে তাঁদেরই অন্যতম হিসাবে রাসবিহারী ভারতের সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনকে কিভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এইবার আমরা তাঁর জীবনের সেই গৌরবময় কাহিনী বলব।

ছয়

চারুচন্দ্র রায়ের পর রাসবিহারীর কিশোর জীবনে আরেকজনের প্রভাব উল্লেখ্য। তিনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পরবর্তী কালে ইনিই নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯০৬ সনে ইনি পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিপ্লব প্রচারে ভ্রমণ করেন। সর্ব-ভারতীয় বিপ্লব সংঘটনে সেদিন এঁর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রধানত এঁরই নির্দেশে রাসবিহারী বাংলার বাইরে উত্তরপ্রদেশকে তাঁর কর্মের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবের অগ্নিময় পথে যেদিন তরুণ রাসবিহারী পদক্ষেপ করেছিলেন, যেদিন তিনি একাকী বিপ্লবের পতাকা স্কন্ধে নিয়ে বাংলা ত্যাগ করে সর্বভারতীয় সংগঠনের পথে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তখন তাঁর কানে তাঁর শিক্ষা-দাতা গুরু চারুচন্দ্র রায় নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি কথা বলে দিয়েছিলেন—

'পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।'

সত্যি কথা বলতে সেদিনের বাংলার বিপ্লবী সন্তানগণ রুদ্রের প্রসাদ মাথায় নিয়েই আবর্তসংকুল বিপ্লবসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ঢেলে দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে এই ব্রতাচরণে নিযুক্ত থেকে বিপ্লবকে তাঁরা কি নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছিলেন এবং একে কত-খানি ব্যাপ্তি দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, এঁদের জীবনের সেইটাই হলো আসল কথা। বিপ্লবী জীবনের এই নিগূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারলে এঁদের জীবন আলোচনা করা বৃথা।

চন্দননগর ও কলিকাতার স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন রাসবিহারী। স্কুলে বিদ্যার্জনে তিনি অবহেলা করেছিলেন, কিন্তু সকল অভাব পূর্ণ করেছিলেন নিজের চেষ্টায়। স্কুলে পড়বার সময়েই তাঁর মনে সামরিক বিভাগে একটি চাকরি লাভের জন্য আগ্রহ দেখা দেয়। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল যে, রাসবিহারী সরকারী কর্মে প্রবিষ্ট হন এবং এজন্য তিনি চেষ্টাও করেছিলেন। পরে তাঁর মেসোমশাই তাঁকে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে একটা চাকরি করে দেন। এইখানে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি আর একটা চাকরি নিয়ে কসৌলি যান। এই চাকরিটা ঠিক তাঁর মনঃপূত ছিল না। অবশেষে বিনোদবিহারী বসু সিমলায় তাঁর অফিসের এক প্রভাব-সম্পন্ন ইংরেজ অফিসারকে ধরে পুত্রকে দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনষ্টিট্যুটে একটি ভাল চাকরি যোগাড় করে দিলেন। সাধারণ কেরানির চাকরি। এইখানে অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় প্রতিভা ও কার্যদক্ষতার গুণে রাসবিহারী হেড ক্লার্কের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। "তাঁর স্বভাবের এক আশ্চর্য মনোমোহনকারী রূপ ছিল। যার ফলে তিনি অতি সহজেই সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রত্যেকেই তাঁকে নিজের বিশ্বস্ত লোক হিসাবে গণ্য করতো।" এই চাকরিটা তাঁর মনের মতো ছিল। মনের মতো ছিল এই জন্য বলছি যে, এরই সুযোগে তিনি সরকারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না করে স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছিলেন। গভর্নরের স্টেনোগ্রাফার হয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) যেমন বিপ্লবের অগ্নিময় পথে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, রাসবিহারী বসুও ঠিক তেমনি সরকারী কর্মের অন্তরালে তাই করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেরাদুনের বনবিভাগ দপ্তরের একজন হেডক্লার্ক যে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা করবেন, বড়লাটের উপর বোমা ফেলবেন—একথা কেই বা সেদিন কল্পনা করতে পেরেছিল ? এই দেরাদুনে বসেই তিনি যে

কিভাবে নিঃশব্দে ও সদাসতর্ক ইংরেজ গোয়েন্দা পুলিশের চক্ষে ধূলো দিয়ে ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, সে কাহিনী উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। ঝিলম থেকে গঙ্গার তীর পর্যন্ত এবং ভারত ছাড়িয়ে সুদূর ব্রহ্মদেশের মেমিয়ো পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এই সংগঠন। আবার এই দেরাদুনে বসেই ফরেস্ট রিসার্চ অফিসের হেডক্লার্ক রাসবিহারী বসু কিভাবে ভারতের বাইরে একদিকে সান-ফ্রান্সিসকো থেকে বার্লিন পর্যন্ত এবং অপর দিকে কোবে থেকে কাবুল পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সে ইতিহাসও কম চিত্তস্পন্দী নয়। এই যে ব্যাপক সংগঠন আর সংযোগ—এর লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টির সঙ্গে তাঁর নেতৃস্থানীয় ও সহকর্মিদের মধ্যে অনেকেই কমবেশি পরিচিত আছেন। এই অসাধ্য সাধন তিনি করেছিলেন মাত্র তিন বছরের মধ্যে। 'রাসবিহারীদা' তিন বছরের মধ্যে যেন ত্রিশ বছরের কাজ করে দিয়েছেন—আমাদের নেতাদের মধ্যে এমন প্রতিভা আমি কমই দেখেছি।"—এই কথা বলে-ছেন তাঁরই অনুগামীদের মধ্যে কাশীর স্বনামধন্য বিপ্লবী শচীন সান্যাল। বস্তুত ১৯১১ থেকে ১৯১৬—অর্থাৎ তাঁর জাপান-যাত্রার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত—এই সময়টাই রাসবিহারী বসু প্রকৃতপক্ষে এই দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন আর এই তিন বছর কালের মধ্যেই ভারতে ইংরেজ গোয়েন্দা-পুলিশের চক্ষে তিনি কিভাবে রহস্যময় ব্যক্তি (Mystery man) বলে পরি-গণিত হয়েছিলেন, তার বিবরণ আছে সিডিসান কমিটির রিপোর্টে ও মাইকেল ও'ডায়ারের রচনায়। কৌতূহলী পাঠক সেগুলি পাঠ করতে পারেন।

সরকারী চাকরি করা আর সেইসঙ্গে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির কাজে নিযুক্ত থাকা কেমন করে সম্ভব তা দেখিয়ে গেছেন বাঘা

যতীন, দেখিয়ে গেছেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী। বৈপ্লবিক সংগঠনে বাংলায় বাঘা যতীন আর বাংলার বাইরে রাসবিহারী যে রকম অত্যাশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। ১৯০৮ সনে মজঃফরপুরে যখন বোমা ফাটল তখন সেই সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ যেরকম সচকিত হয়েছিল তেমন আর কিছুতে হয় নি। এই শতাব্দীর প্রথম পাদে সেই বিস্ফোরণ ছিল ভূমিকম্পের তুল্য। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর বোমায় সশস্ত্র বিপ্লবের যে আগমনী সেদিন ঝঙ্কৃত হয়েছিল, ১৯৪৭ সনের ১৫ই অ'গস্ট স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার অনুরণন শোনা গিয়েছিল। সেদিন যে ঝড় উঠেছিল সে ঝড় আর থামে নি। ইতিহাসের ঝড় কোনোদিন থামে না। মজঃফর-পুরের সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ জানিয়ে দিল যে ভারতবর্ষে একটি নূতন তন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। স্যর হেনরি কটন এরই নাম দিয়েছিলেন 'Bomb-cult'; এই তন্ত্রের পরবর্তী সাধকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রাসবিহারী। সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন এইজন্য বলছি যে, মজঃফর-পুরের ঘটনার ঠিক চার বছর পরে ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লীতে যে তার চেয়েও চাঞ্চল্যকর আর একটা বিস্ফোরণ ঘটবে, একথা রাজশক্তি ঘুণাক্ষরেও অনুমান বা কল্পনা করতে পারে নি।

সেদিনকার ভারতে লোকমান্য টিলকই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁর নিজস্ব 'কেশরী' পত্রিকায় মজঃফরপুরের ঘটনা সম্পর্কে পাঁচটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এটা সেদিন অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ ছিল। টিল-কের পর একমাত্র অরবিন্দ ভিন্ন এইরকম দুঃসাহস আর কেউ দেখাতে পারেন নি। ১৯০৭, ৭ই মে পাঞ্জাবে সর্দার অজিত সিং, লালা লাজপত রায় প্রমুখ কয়েক জনকে যখন রেগুলেশন আইনে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তখন 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তিনি যে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখেছিলেন তা ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ১১ই মে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁর নির্ভীক লেখনীমুখে অগ্নি

উদ্গীরিত হলো। তিনি লিখলেন : "The hour for speeches and fine writings is past. The bureaucracy has thrown down the gauntlet. We take it up." মজঃফরপুরের বিস্ফোরণ সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধে টিলক লিখলেন (১২মে, ১৯০৮) : "The Swadeshi agitation gives rise to bomb outrages and the Bengal partition gives rise to the Swadeshi agitation ; then why not first cancel the Bengal partition itself." অপর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখলেন (২রা জুন, ১৯০৮) : "When the official class begins to overawe the people without any reason and when an endeavour is made to produce despondency among the people by unduly frightening them, then the sound of the bomb is spontaneously produced to impart to the authorities the true knowledge that the people have reached a volcanic stage than the vapid one in which they pay implicit regard to such an illeberal policy of repression." তরুণ রাসবিহারীর হৃদয়ে সেদিন অরবিন্দ-টিলকের এই রচনা কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

এইবার আমরা ১৯১১ থেকে ১৯১৫—এই সময়ের মধ্যে বাংলার বাইরে উত্তর ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টায় রাসবিহারীর নেতৃত্বের স্বরূপ কি রকম ছিল সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে তাঁরই অন্যতম সতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' গ্রন্থে যে বিবরণ সন্নিবেশিত করেছেন তারই কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো। এই বিবরণ অবশ্য ডক্টর দত্তের নিজের নয়, এটা তাঁরই অনুরোধে ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়ার জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন রাসবিহারীর সমসাময়িক উত্তর-

পশ্চিম ভারতের বিপ্লবী কর্মীদের অন্যতম নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। নলিনীবাবু লিখেছেন ঃ

"রাসবিহারী বসু চন্দননগরে সর্বপ্রথম বৈপ্লবিকদের সংস্পর্শে আসেন। বাঙ্গালার বৈপ্লবিক দল কর্তৃক তিনি উত্তর ভারতে প্রচার ও সংঘ স্থাপনের জন্য প্রেরিত হন। তথায় যাইয়া দেরাদুনে বন-বিভাগে কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। এইস্থান হইতেই তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই সময়ে তাঁহার এই জ্ঞানোদয় হয় যে, ভারতের স্বাধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি গুপ্ত-সমিতিসমূহ স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং কর্মীদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, নিজ চরিত্রগুণে তিনি তাঁহাদের নিকট বিশেষ প্রিয় হন। তিনি নিজের কর্মতৎপরতার দ্বারা উত্তর ভারতব্যাপী গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করেন। এই সময়েই আমি, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শেঠ দামোদর স্বরূপ, আউধ-বিহারী, বঙ্কিমচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি তরুণেরা তাঁহার সহকর্মীরূপে কার্য করিতে থাকে। এই দলের সহিত বাঙ্গালার বৈপ্লবিকদের যোগাযোগ ছিল। বাঙ্গালা হইতে অর্থ প্রেরণ করা হইত। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা বসন্ত বিশ্বাস ও মন্মথনাথ বিশ্বাস বাঙ্গালা হইতে প্রেরিত হন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ইহারা একটি বাড়ির ছাদ হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ভাইসরয় হার্ডিঞ্জকে আঘাত করেন।

"এই কর্মের ফলে ইংরেজ গভর্নমেণ্টও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া রাসবিহারী ও তাঁহার সহকর্মীদের ধরিবার জন্য নানা জাল পাতিতে লাগিল; নানা পুরস্কার ঘোষিত হইল। এই সম্পর্কে শ্রীআউধবিহারী এবং অন্য একজন ভদ্রলোক ধৃত হন। তাঁহাদের উপর নৃশংস অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁহারা স্বীয় দীক্ষায় অটল থাকেন এবং একটি নাম-মাত্র বিচার দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

"রাসবিহারী তিন বৎসরের জন্য তাঁহার কর্মকেন্দ্র কাশীতে

স্থানান্তরিত করেন। তিনি তথা হইতে উত্তর-ভারতের সমস্ত গুপ্ত-সমিতির নেতাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন। আমি তখন কাশীতে ছাত্র ছিলাম। শচীন্দ্র সান্যালের নেতৃত্বে আমাদের দ্বারা ১৯১০ সনে তথায় 'যুবক সমিতি' স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। শারীরিক, ধর্মগত এবং সাহিত্যিক চর্চার জন্য ইহার অন্তর্গত কয়েকটি বিভাগ ছিল। এই সমিতির আর একটি বিভাগ ছিল; গুপ্ত বা ভিতরকার গণ্ডী। কুইনস কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি জনপ্রিয় এবং স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই ভারতের মুক্তিকামী ছিলেন। তিনি আমাদের অনেককে এই ভিতরকার গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা কাশীর বিভিন্ন মহল্লায় সমিতির শাখা স্থাপন করিয়া ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতার মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলাম। ইহা ব্যতীত, মদনপুরায় 'আদর্শ বিদ্যালয়' নামক একটি বিদ্যালয় বালকদের জন্য স্থাপন করা হয়। বালকদের মনকে বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

"এই সময়ে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে রাসবিহারী বসু কাশীতে আসেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বৈপ্লবিকদের কর্মতৎপরতা সহস্রগুণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। আমরা নূতন জীবন, প্রেরণা এবং উদ্যম প্রাপ্ত হই। একজন অবসরপ্রাপ্ত হেলথ অফিসারের বাড়িতে তাঁহার বাসের জন্য ঘর ভাড়া করা হয়। বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতির সভ্যগণ শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য সেখানে আসিতে লাগিলেন। একদিন যখন তিনি, কি প্রকারে একটা বোমাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে ফেলিতে হয় এই শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন তাহা হঠাৎ ভীণষ শব্দে ফাটিয়া যায়। আমরা সামান্য আঘাত পাইয়া বাঁচিয়া যাই। আমরা বাড়িওলাকে বলি যে একটা সোডার বোতল ফাটিয়া ঐ শব্দ হইয়াছে। আমরা তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে বাসস্থল উঠাইয়া লইলাম।

"ইহা স্থির ছিল যে, রাসবিহারী এবং পিঙ্গলে লাহোরের বিদ্রোহ পরিচালনা করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একজন জমাদার বিশ্বাস-ঘাতকতা করে। রাসবিহারী ইহা জানিতে পারেন এবং এই বিশ্বাস-ঘাতককে গুলি করার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে পলাইয়া যায়। ২৩শে তারিখে হঠাৎ বৈপ্লবিক উত্থানের চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে, একটি বোমাসমেত পিঙ্গলে ব্যারাকে ধৃত হন এবং পরে ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন করেন। রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তিনি কাশীতে পলাইয়া যান। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার বিশেষ চেষ্টা হওয়ায়, রাসবিহারীকে শেষ পর্যন্ত ভারত ত্যাগ করিয়া জাপান চলিয়া যাইতে হয়। ঠিক হয় যে, তিনি জাপান হইতে কার্য করিবেন।"

এই বিবরণের মধ্যে সূত্রাকারে যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, রাসবিহারীর জীবনের প্রেক্ষাপটে সেই ইতিহাসকে সংস্থাপিত করতে হলে, কিছু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বাংলার সঙ্গে উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদের সংযোগ সব সময়ই ছিল এবং এইদিকের বিপ্লব-প্রয়াস যাতে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে সেজন্য নিয়মিত অর্থসাহায্যও লোক মারফৎ প্রেরিত হতো। এই টাকা বাংলার বিপ্লবীরা প্রধানত ডাকাতি করে সংগ্রহ করতেন; কোনো কোনো দেশবিখ্যাত ব্যক্তির গোপন দানেও বিপ্লবীদের তহবিল যে পূর্ণ না হতো তা নয়। তবে বিপ্লবীদের তহবিল কখনো তাদের আশানুযায়ী গড়ে উঠতে পারে নি এবং পারে নি বলেই তাদের অনেক পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়, অনেক প্রয়াস ব্যর্থ হয়—একথা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মুখে লেখক অনেক-বার শুনেছেন। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, ডাকাতির অনেক অর্থ ও লুণ্ঠিত স্বর্ণালঙ্কার অনেকে বেমালুম আত্মসাৎ করেছিলেন; এই ঘৃণ্য কাজ যাঁরা করতেন তাঁরা ছিলেন দুর্বলচিত্ত এবং দলের মধ্যে তাঁরা 'Black Ship' বলে চিহ্নিত হতেন।

উপরিউক্ত বিবরণে বলা হয়েছে যে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের (ইনি

ছিলেন দ্বিতীয় হার্ডিঞ্জ, বিদ্যাসাগরের যুগে ঐ নামের আরেকজন ভাইসরয় ছিলেন) উপর ১৯১১ সনে বোমা ফেলা হয়। এই তারিখটা ভুল। বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯১২ সনের ২৫শে ডিসেম্বর। এই ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিবরণ আমি যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, এখানে দিলাম। আগেই বলেছি, কার্জনী বিধান এক হিসাবে শাপে বর হয়েছিল বা বিপরীতে হিত হয়েছিল। ছায়া পূর্বগামিনী, এটা বুঝে-ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৯৬ সনের পরিবেশ থেকেই তাঁর মনের মধ্যে ভাবীকালের ছায়াপাত হয়েছিল, একথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে প্রায় ছয়টি বছর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এর মধ্যে বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় হলো ১৯০৫ সনটি। এই বছরে যে নবযুগের সূচনা হয় তার প্রভাব ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তথা আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূর-প্রসারী হয়েছিল। লর্ড কার্জন বাঙালীর নব-উন্মেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করতে গিয়ে একে তিনি আরো উস্কিয়ে দিয়েছিলেন। সেই উস্কানিতেই জাতীয়তার দীপ আরো বেশী জ্বলে উঠল। চরমপন্থী রাজনীতি এইবার আত্মপ্রকাশ করল।

দেশে যখন বঙ্গভঙ্গ-জনিত আন্দোলন শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ জ্বলন্ত অবস্থায় এসে পড়েছে তখন (১৯১০) লর্ড হার্ডিঞ্জ এলেন বড়লাট হয়ে। তিনি এসে প্রত্যক্ষ করলেন যে ভারতে বৈধ বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দো-লনের পাশাপাশি চলেছে একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন ; কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠেছে সারা দেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি। লর্ড হার্ডিঞ্জ ছিলেন উদারনৈতিক মন্ত্রিসভার নির্বাচিত বড়লাট। তাঁর বিচক্ষণতার উপর ভরসা করেই ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের, তৎকালীন বিক্ষুব্ধ পরিবেশকে শান্ত ও সংযত করার উদ্দেশ্যেই তাঁকে কার্জনের স্থলে পাঠানো হয়েছিল। হার্ডিঞ্জ প্রথমেই সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ

নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর দু'মাস পরে ২৫শে আগস্ট, ১৯১১, লর্ড হার্ডিঞ্জের গভর্নমেণ্ট কার্জনী বিধান বাতিল করে দেওয়ার জন্য বিলাতে ভারত-সচিবের কাছে সুপারিশ করে পাঠালেন। তাঁর এই সুপারিশের ভিত্তি ছিল একটি মেমোরিয়াল বা স্মারকলিপি যেটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে বড়লাটের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। ভারত-সচিব লর্ড হার্ডিঞ্জের এই সুপারিশ গ্রহণ করলেন। তারপর ঐ বছরের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘোষণা করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটি মারাত্মক ঘোষণা ছিলঃ ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

নবজাগ্রত বাংলা তথা বাঙালী সেদিন ইংরেজ আমলাতন্ত্রের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার উপর বোমা-বারুদের গন্ধ সেই শিরঃপীড়াকে আরো অসহনীয় করে তুলেছিল। বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা বাতিল করবার প্রস্তাবের সঙ্গে হার্ডিঞ্জের ডেসপ্যাচে রাজধানীকে কলিকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও ছিল। এই প্রস্তাবের মূল উদ্ভাবক অবশ্য ছিলেন বিদায়ী বড়লাট কার্জন। কলি-কাতা তখন শুধু ভারতের রাজধানী ছিল না, এই শহরই ছিল প্রকৃত-পক্ষে ভারতের পলিটিক্যাল ও ইনটেলেকচুয়াল রাজধানী। বঙ্গভঙ্গ রদ হলো বটে, কিন্তু বাঙালীর প্রাধান্যকে খর্ব করবার অভিপ্রায়ে দিল্লীকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করা হলো। সেদিন এর বিরুদ্ধে মাত্র একজন বাঙালী-সন্তানের কণ্ঠে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি ব্যাঘ্র-প্রতিম পুরুষ, স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৯১২ সনের কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টাকে বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটি বড়ো রকমের সংকট বা crisis বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "Calcutta, Bengal, are discrowned and cannot help feeling desolate.

The gloom of grievous bereavement lies heavy on our minds, we feel like men who have fallen from their high estate."

জাতির এই দুর্ভাগ্য, এই বেদনা, এই অপমান আশুতোষের মতো আরেকজন বাঙালী যুবকের হৃদয়ে দারুণ বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছিল সেদিন। তিনি রাসবিহারী বসু। দেরাদুনে বসে যখন তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ ও রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার রাজকীয় ঘোষণা জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করলেন। একটা কিছু করতে হবে, যাতে করে ব্রিটিশ রাজশক্তি বুঝতে পারে যে, যে কোনো স্বৈরাচারী বিধান নির্বিচারে মেনে নেওয়া বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কি করা যায়? কিছুকাল পরে জানা গেল যে এক বছর পরে (১৯১২ সনের বড়দিনের সময়) দিল্লীতে সাড়ম্বরে নূতন রাজধানীর উদ্বোধন হবে এবং জৌলুষের সঙ্গে বড়লাটের State entry হবে। এই সংবাদ জানার পর রাসবিহারী তাঁর প্ল্যান ঠিক করে ফেললেন। ঐ শোভাযাত্রার সময়েই লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ফেলতে হবে। যথাসময়ে এইরকম দুইটি বিস্ফোরক বোমা চন্দননগর থেকে তৈরী হয়ে দেরাদুনে তাঁর কাছে লোকমারফৎ এসে গেল। এই কাজে দু'জন সাহসী সহকর্মীরও দরকার। বসন্ত বিশ্বাস ও মন্মথনাথ বিশ্বাসকে নির্বাচিত করে তাঁর কাছে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের দু'জনকে যথারীতি ট্রেনিং দিলেন তিনি এবং উদ্বোধনের ঠিক এক সপ্তাহ আগে তিনি তাদের নিয়ে দিল্লী চলে আসেন। সেই সময়ে তিনি অধ্যাপক আমীরচাঁদের গৃহে অবস্থান করেছিলেন।

কিন্তু বোমা ফেলা হবে কি করে? বড়লাট শোভাযাত্রা সহকারে নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করবেন, সিপাই-সান্ত্রী, গোয়েন্দা-পুলিশ, সামরিক পুলিশ ঘিরে থাকবে এই শোভাযাত্রাকে। তাদের সতর্ক এড়িয়ে এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করা যায় কি করে? রাস-

বিহারীর উর্বর মস্তিষ্ক, উপায় উদ্ভাবনে তাঁর বিলম্ব হলো না। চাঁদনী-চকের একধারের একটি বাড়ির ছাদে মহিলা দর্শকদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। দোতলার ছাদ, আর ঠিক সেই ছাদের নীচে সামনের রাস্তা দিয়েই হাতী চড়ে যাবেন বড়লাট। রাস্তা থেকে ছাদের দূরত্ব খুব বেশী নয়। ঘটনার দিন ছদ্মবেশ-ধারণে নিপুণ রাসবিহারী, বসন্ত ও মন্মথকে স্বহস্তে মুসলমানী স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সজ্জিত করে, স্বয়ং তাদের খিদমৎগাররূপে সঙ্গে ছিলেন। অসংখ্য মহিলা দর্শকদের মধ্যে তাঁরাও যথাসময়ে গিয়ে তাঁদের আসন করে নিলেন। এমন উচ্চাঙ্গের ছদ্মবেশ হয়েছিল তাঁদের যে, দেখলেই মনে হবে এঁরা বুঝি কোনো সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার পরিবারের স্ত্রীলোক ; তাই এঁরা সহজেই ছাদের প্রথম সারিতে বসতে পেরেছিলেন। তাঁদের ওড়নার তলায় যে মারাত্মক বোমা ছিল, সেটা ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারে নি। তারপর তুমুল বাদ্যধ্বনি সহকারে সেই জমকালো শোভা-যাত্রা চাঁদনীচকের পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছল। সেই বাড়ির ছাদেই মেয়েদের মধ্যে বসেছিলেন ছদ্মবেশী সেই তরুণ দুটি। শোভাযাত্রা কাছে আসতেই তাঁরা অমনি সজাগ হন। তারপর শোভাযাত্রা ধীর-মন্থর গতিতে এসে পৌঁছল সেই বাড়ির ছাদের নীচে পর্যন্ত। তরুণ দুটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অমনি নিবদ্ধ হয় সুসজ্জিত হাতিটির প্রতি। শরীর-রক্ষীর প্রথম দলের ঠিক পিছনেই ছিল বড়লাটের হাতী। জয়পুরের মহারাজার তত্ত্বাবধানে এই হাতী সজ্জিত হয়েছিল—সে সজ্জার শোভা ছিল সত্যিই নয়নলোভন। হাতীর মাথায় বসে আছে সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত মাহুত আর মাহুতের ঠিক পিছনেই মুক্তার ঝালর দেওয়া হাওদার ভিতরে সমাসীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ। দর্শনার্থীদের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছে সেই হাতীর দিকে।

ক্রুম্!

চারদিক সচকিত হয়ে উঠল সেই শব্দে। ধোঁয়ায় ভরে গেল

হাতীর চারদিক। মুহূর্তমধ্যে বাদ্যধ্বনি থেমে যায়, শোভাযাত্রা হয় ছত্রভঙ্গ। রাস্তায় ও ছাদের উপরে দর্শকদের মধ্যে পড়ে যায় হৈ-চৈ। বড়লাটের মাথার উপরেই বোমা এসে পড়েছে। কোথা থেকে পড়ল? একজন দর্শক বলল—ঐ মেয়েদের ভেতর থেকে। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, দু'জন মুসলমানী দুটো বোমা বড়লাটের হাতীকে তাক করে ছুঁড়ল। স্ত্রীলোকে বোমা নিক্ষেপ করল? ইয়া আল্লা, এ বড়ি তাজ্জিব বাৎ, বলে একজন মুসলমান ফকির। এদিকে ঐ বিস্ফোরণের ফল কি হলো, তা জানবার জন্য অতি নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন রাস-বিহারী খিদমৎগারের ছদ্মবেশে। না, লর্ড হার্ডিঞ্জের মাথার উপর বোমা 'হিট্' করে নি, 'হিট্' করেছে হাতীর চালককে। মাহুত মারা গেছে; বেঁচে গেছেন বড়লাট। ভাগ্যের জোর, বলতে হবে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে অবস্থান করা বিপজ্জনক। বসন্ত ও মন্মথ ততক্ষণে ভীড়ের মধ্যে উধাও হয়ে পূর্বনির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছেন। আর রাসবিহারী? তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার ত্রিশ বছর পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রাসবিহারী বসু বলেছিলেন: "It was about thirty years ago, I threw a bomb on Viceroy in Delhi." তাঁর এ উক্তি মিথ্যা নয়। এর তাৎপর্যটা এই যে, এই অসমসাহসিক ঘটনার পিছনে সেদিন একমাত্র তাঁরই মস্তিষ্ক সক্রিয় ছিল। বসন্ত ও মন্মথ বিশ্বাসের হাতের পিছনে তাঁরই বলিষ্ঠ হস্ত সক্রিয় ছিল। সুতরাং "আমি বোমা নিক্ষেপ করেছিলাম"— ইতিহাসের দৃষ্টিতে রাসবিহারীর এই উক্তি যথার্থ।

এতবড়ো একটা ঘটনায় সারা ভারত যেন সচকিত হয়ে উঠল। উঠবারই কথা। মডারেট নেতারা বিচলিত হলেন। এই বোমা নিক্ষেপের সংবাদ জানার পর ভারতের প্রায় সর্বত্র এই বিপ্লবাত্মক কাজের নিন্দা করে ও বড়লাটের প্রাণরক্ষা পাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে অনেক রাজভক্ত প্রজা সভা-সমিতির আয়োজন করেছিলেন।

এই রকম একটি সভার আয়োজন দেরাদুনেও হয়েছিল। এই সভাটি সম্পর্কে হার্ডিঞ্জ স্বয়ং তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"দেরাদুন যাবার পথে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল।··· দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল এই। আমি যখন স্টেশন থেকে একখানি মোটর গাড়ী চড়ে আমার বাংলোয় যাচ্ছিলাম,তখন আমি একজন ভারতীয়কে তাঁর বাসভবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক ছিল। সকলেই আমাকে দেখে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জান'ল। তারপর আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, যে ভদ্রলোককে আমি তাঁর বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তিনি দুইদিন পূর্বে দেরাদুনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং দিল্লীতে আমার প্রাণনাশের যে চেষ্টা হয়েছিল সেজন্য নিন্দা প্রকাশ করে তিনি একটি প্রস্তাব ঐ সভায় উত্থাপন করেন ও সেটি গৃহীত হয়। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে এই ভদ্রলোকই আমাব উপর বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন।"

আসলে বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনাটি ছিল একমাত্র রাসবিহারীর, কিন্তু কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল তাঁর ঐ দুই সহকর্মীর দ্বারা। তবে যেহেতু এই ব্যাপারের নেপথ্য নায়ক ছিলেন তিনি, সেইজন্য হার্ডিঞ্জও তাঁর স্মৃতিকথায় রাসবিহারী বসু বোমা নিক্ষেপ করেছেন—এই উক্তি করেছেন। তবে আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, এই ঘটনার পিছনে ছিল ইতিহাসেরই অপ্রতিরোধ্য বিধান। এই প্রসঙ্গে বসুধা চক্রবর্তী একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "Who put it into the head of Rashbehari Basu to think and act like that ? The impelling force of history was silently but inexorably at work .. Freedom from foreign rule had already in the beginning of this century become

an objective necessity for India. The blow that he struck at British Imperialism on the streets of Delhi apparently blew over, but the bomb reverberated through the corridors of time into the portals of history." একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, দিল্লীর রাজপথে সেদিন সেই স্ফুলিঙ্গই ঘটনাপুঞ্জের অনিবার্য ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এক প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করেছিল। ভারতের আকাশ সেই দাবানলে রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল আর ভারতের সমকালীন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর তার কিছু উত্তাপ যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল, তা অনুমান নয়, ঐতিহাসিক সত্য।

সাত

"মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে আয়োজন ও প্রয়োজনে মিলিয়ে যখন দেখি সংকল্প করা হয়েছে অথচ নৈবেদ্য যথেষ্ট নয়, তখন ভাবি দেশে আগুন লেগে গেছে।"—বিপিন পালের এই বক্তৃতার মধ্যে বাংলার তরুণদের উদ্দেশে যে অনুযোগ ছিল তা বৃথা হয় নি। ক্ষুদিরামকে দিয়ে যে নৈবেদ্যের শুরু, বিপ্লবযজ্ঞে ভারে ভারে ঐ রকম নৈবেদ্য অচিরকাল মধ্যেই মায়ের চরণে এসে পড়তে লাগল। বাংলার বুকে ধীরে ধীরে জেগে উঠল যৌবন-জল-তরঙ্গ। সে তরঙ্গ ক্রমে পরিব্যাপ্ত হয় সারা ভারতে। পুণায় চাপেকার-ভ্রাতাদের আত্মবলিও বৃথা হয় নি। সত্যি কথা বলতে ভারতে আধুনিক যুগে প্রকৃত জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার বনিয়াদ রচনা করেছিলেন মহারাষ্ট্রীয় বীরেরা। পুণার 'ডেকান সভা' ও ফার্গুসন কলেজ—এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল সেদিনকার বৈপ্লবিক চিন্তার পীঠস্থান। লোকমান্য টিলক ও দেশ-ভক্ত রাজনৈতিক সন্ন্যাসী গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের ত্যাগ, তেজস্বিতা ও দেশপ্রেম সেদিন উদ্বুদ্ধ করেছিল পরবর্তীকালের বিপ্লবী বীর সাভার-কারকে। মহারাষ্ট্রের এই স্বনামধন্য বিপ্লবী সন্তানও ছিলেন রাস-বিহারীর সমসাময়িক। ছাত্রজীবনেই তিনি 'অভিনব ভারত' নামে যে গুপ্ত-সমিতি গড়ে তুলেছিলেন তা ইংরেজ সরকারের নিকট রীতি-মতো আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সাভারকারই তরুণ বয়সে বলেছিলেন : "Independence and liberty, I look upon as the very pulse and breath of nation." ১৯০৬ সনেই ইনি লণ্ডনে গিয়ে পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার নেতৃত্বে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে জাপান থেকে সাভারকার ও রাসবিহারীর মধ্যে বহু পত্র বিনিময় হয়েছিল।

দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর রাসবিহারীর নেতৃত্বে যে বোমা পড়েছিল সেটা শুধু যে একটা বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ মাত্র ছিল তা মনে করলে ভুল হবে, যেমন ভুল হবে যে শুধু বঙ্গভঙ্গের জন্যই সেদিন অতটা মাতামাতি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন : "অর্থনৈতিক দুর্দশা, রাজনৈতিক নৈরাশ্য, সামাজিক দুর্গতি এইগুলি পুঞ্জীভূত কারণ হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে কাজ করছিল। তাই তুষানলের ধিকি ধিকি আগুন সময়েব সুবাতাস পেয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। সেইজন্য বাংলার মনস্তাপ সারা ভারতের বুকের বাড়বানলে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।"

মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষিপ্ত হলে তার সমর্থনে বোম্বাইয়ের একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, স্বরাজ-লাভের জন্য ভারতীয়েরা সব কিছু করতে প্রস্তুত। আর টিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় এই উপলক্ষ্যে একাধিক প্রবন্ধ লিখে ছয় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। দিল্লীর বোমা বিস্ফোরণের উপর কোনো পত্রিকায় সমর্থনসূচক কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল কি না তা জানা যায় না। যাই হোক, বাংলা দেশে তখন সক্রিয়ভাবে যে তিনটি দল, যথা—অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর ও চন্দননগর—বৈপ্লবিক কাজকর্মে লিপ্ত ছিল, রাসবিহারী ছিলেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আর যুগান্তর ও চন্দননগর দলের মূল নেতা ছিলেন অরবিন্দ। সেই হিসাবে তাঁকে অরবিন্দের শিষ্য বলতে বাধা নেই। মানিকতলার বাগানে বিপ্লবের যে আয়োজন চলেছিল, তার সঙ্গে রাসবিহারী যে সংযুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ হিসাবে পুলিশ অনুসন্ধানের সময় 'রাসবিহারী বসু' স্বাক্ষরিত কয়েকখানি পত্র উদ্ধার করেছিল, কিন্তু তাঁকে সন্দেহ করে ঐ মামলায় আসামী হিসাবে উপস্থাপিত করবার উপায় ছিল না। কারণ সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত থেকেও তিনি

কোনো দিন পুলিশের সন্দেহভাজন ছিলেন না। এইটাই ছিল তাঁর রণ-কৌশল। কলিকাতা পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা ডেনহ্যাম সাহেব তো চন্দননগরের গুপ্ত-সমিতির সংবাদ জানবার জন্য রাসবিহারীর উপর ভার দিয়েছিলেন। দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ অফিসে কেরাণীর ভূমিকাটি যে তিনি অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করেছিলেন তা এখন জানা গেছে। মন্ত্রগুপ্তি বিপ্লবের সাধনায় একটা বড়ো কথা। রাস-বিহারী এই সাধনায় একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল প্রধানত একটি কারণে। ছদ্মবেশ ধারণে তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। সে যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে এই ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না, বলা চলে। শুধু কি ছদ্মবেশ? সেই সঙ্গে ভারতের কয়েকটি ভাষা, বিশেষ করে হিন্দী, উর্দু, গুমুখী ও পাঞ্জবী ভাষায় কথা বলতে তাঁর মতো আর কেউ পারতেন না।

বিপ্লবী রাসবিহারীর প্রতিভার একটা বড়ো দিক ছিল ছদ্মবেশ ধারণে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। এ বিদ্যা তাঁর ছিল সহজাত, কারো কাছে তিনি এর পাঠ গ্রহণ করেন নি। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবে যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন বহুগুণে ভূষিত। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও চরিত্রে এঁরা সকলেই ছিলেন এক-একজন দিক্‌পাল। এ ছাড়া, তাঁদের অনেকের মধ্যেই নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত। বিপ্লবীরা জানতেন যে, প্রতি-পদক্ষেপে তাঁদের দুস্তর বাধা-বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়—এই শিক্ষাটা তাঁরা গোড়া থেকেই পেয়েছিলেন, এবং এটা তাঁদের মনের মধ্যে চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। আর এই বিপদ ও বাধা কখন কোন্ দিক থেকে কিভাবে আসবে তা জানবার উপায় ছিল না, কিন্তু সেজন্য তাঁদের কোনো মানসিক উদ্বেগ ছিল না। উদ্বেগ ছিল না বলেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাঁরা খুব বেশি চিন্তিত হতেন না। সে রকম সময়ও পেতেন না।

বিপদ আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে এমন অপূর্ব কৌশল তাঁরা আবিষ্কার করতেন এবং এমন নিপুণভাবে, এত তৎপরতার সঙ্গে তা কাজে লাগাতেন যে, শত্রুব্যূহ ভেদ করে অথবা পুলিশের সতর্ক চক্ষে ধুলো দিয়ে তাঁরা বেরিয়ে আসতেন।

রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী জীবনে এরকম অভাবনীয় ঘটনা বহু ঘটেছিল। হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলবার আগে এমনি একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ এখানে করছি। ইতিপূর্বে কাশীতে অবস্থান-কালে যে বোমা বিস্ফোরণের কথা উল্লিখিত হয়েছে, এটি সেই প্রসঙ্গে। বোমায় কেমন করে অগ্নি-সংযোগ করতে হয়, এটা দেখাতে গিয়ে ঐ বোমাটি ফেটে যায়। ফলে রাসবিহারী পায়ে খুব গুরুতর আঘাত পান আর অপরজনের আঘাত ছিল অপেক্ষাকৃত সামান্য। সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীকে তাঁদেরই একজন সহকর্মীর (ডাক্তার কালী-প্রসন্ন সান্যাল) গৃহে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তিনিই তাঁর চিকিৎসা করতে থাকেন। এই সময়ে একদিন সকালে উক্ত চিকিৎসক সহ-কর্মী কাশীর রাজপথে লটকানো একটা পুলিশ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পারেন যে, রাসবিহারী বসুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য গভর্ন-মেণ্ট মোটা পুরস্কার দেবেন। সর্বনাশ! তিনি যে বর্তমানে কাশীতে অবস্থান করছেন এই খবরটা হয়ত অনেকেরই জানা আছে এবং কোথায়, কা'র বাড়িতে আছেন সেটাও হয়ত কেউ-কেউ জানতে পারে। সহকর্মীটি এও জানতেন যে মোটা টাকার লোভে রাস-বিহারী বসুকে ধরিয়ে দেওয়ার মতো দেশদ্রোহীরও অভাব দেশে হবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে পুলিশ-বিজ্ঞপ্তির সংবাদটা তাঁর নেতাকে জানিয়ে দিয়ে বললেন, দাদা, এখানে থাকা তো আর নিরাপদ নয়। বিপ্লবী মহলে বাংলা দেশে বাঘা যতীন আর উত্তর ভারতে রাসবিহারী—এই দুই বিপ্লবী মহানায়কই তাঁদের সহকর্মীদের নিকট 'দাদা' নামে সম্বোধিত হতেন।

এই খবরটি শুনে ঈষৎ চিন্তিত হলেন রাসবিহারী। অন্য সময় হলে কথা ছিল না, কারণ এর আগে বহুবার বহুরকম ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে অপূর্ব অভিনয় করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েও তাদের সন্দেহ ভঞ্জন করে নিস্তার পেতে তাঁর কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। কিন্তু এবার একটু অসুবিধায় পড়তে হলো, কারণ এবার তিনি অসুস্থ এবং পায়ে আঘাত লাগার দরুণ চলাফেরায় নিতান্ত অক্ষম। কাজেই শত্রুর সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে অবিলম্বে অন্যত্র পলায়ন সহজ ছিল না। কিন্তু একটা কিছু করতেই হবে। বিলম্বে বিপদ সুনিশ্চিত।

টাকার লোভে পুলিশের লোকেরা এবং তাদের সঙ্গে দু'একজন সাধারণ লোক যখন রাসবিহারী বসুকে খুঁজতে আরম্ভ করেছে, মদনপুরা আর গোধুলিয়ার বাঙালী মহল্লায় যখন তাঁর খোঁজে তারা গোপনে ঘোরা-ফেরা করছে জানতে পারলেন তিনি, তখন তাঁর মাথায় একটা আশ্চর্য বুদ্ধি খেলে গেল। বুদ্ধিটা অবশ্য মৌলিক নয়। শিবাজী যে কৌশল অবলম্বন করে আওরঙ্গজেবের চোখে ধুলি দিয়ে পলায়ন করেছিলেন, রাসবিহারীর সেটা জানা ছিল। ঐ রকম একটা কিছু করা যায় না? ভাবলেন তিনি। বিপ্লবীর যে চিন্তা সেই কাজ। সহকর্মীটিকে ডেকে বললেন—একখানা খাটিয়া নিয়ে এসো, আর কিছু লোকজন নিয়ে এসো। ঐ খাটিয়ার ওপর শবাকারে শায়িত থাকব আমি। তাই করা হলো। যেদিন সকালে ডাক্তার সান্যালের গৃহের আশেপাশে পুলিশের লোক ঘোরা-ফেরা করছিল, ঠিক সেই সময়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে একটি শবদেহ কাঁধে বহন করে, 'বলো হরি, হরিবোল' বলতে বলতে একদল লোক বেরিয়ে এলো। খাটিয়ার উপর শায়িত শবদেহ নিয়ে তারা চলেছে ঘাটের পথে। পুলিশের লোক ফিরে গেল। শবরূপী রাসবিহারীও তাঁর নিরাপদ স্থানে উধাও হয়ে গেলেন।

অপর একটি ঘটনা আরো চমকপ্রদ। এই ঘটনা ঘটেছিল

লাহোরে। তখন লাহোর থেকে দেরাদুন অবধি রাসবিহারীর বৈপ্লবিক কর্মের পরিধি বিস্তৃত ছিল। তখন তিনি লাহোরে অবস্থান করছিলেন। পুলিশের লোক একটা বাড়ি ঘেরাও করল। তাদের ধারণা রাসবিহারী বসু নিশ্চয়ই সেই বাড়িতে অবস্থান করছেন। এবার আর তাঁর রক্ষা নেই, তাঁকে এবার ধরা দিতেই হবে, কারণ পলায়নের সকল পথই বন্ধ। এবার তারা তাঁকে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, এইজন্য তাদের আনন্দের সীমা নেই। অনুমান তাদের নির্ভুল ছিল। রাসবিহারী তখন সত্যিই ঐ বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য তাদের সফল হলো না। তারা তখন বাড়িটার প্রতিটি রন্ধ্রে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, একটি মাছিও সে দৃষ্টি এড়িয়ে ঢোকবার বা বেরুবার উপায় ছিল না। তখন বাড়ির সদর দরজা দিয়ে এবং পুলিশের চোখের ওপর দিয়েই একটি ঝাড়ুদার ঝাড়ু আব আবর্জনা-পূর্ণ বালতি হাতে স্বাভাবিক ভাবেই বেড়িয়ে গেল। তারা কেউই সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত মনে করল না, পাছে সেই সুযোগে আসল লোকটা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু ঝাড়ুদারটি ঝাড়ুদার ভিন্ন আর কেউ হতে পারে, যদি এ সন্দেহ তাদের মনে ঘুণাক্ষরেও জাগত, তবে সে যাত্রায় রাসবিহারীর পক্ষে নিস্তার পাওয়া কষ্টকর হতো, কারণ তিনিই সেই ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।

ছদ্মবেশ ধারণের এই নৈপুণ্যটা তাঁর আরো কাজে লাগল হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ফেলার ঘটনার পর। এই ঘটনার পর থেকেই পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি আরো প্রখর ভাবে রাসবিহারীকে অনুসন্ধান করতে থাকে। বস্তুত ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে রাজপ্রতিনিধির প্রাণনাশের চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তিকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল। এই ঘটনা ঘটবার পরে পুলিশের ডায়েরিতে তাঁর নামটা অসংশয়িত ভাবেই লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দিল্লী,

লাহোর ও বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে দিয়ে ইংরেজ সরকার সারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শহরে, এমন কি মফঃস্বলের বহুস্থানে ঘোষণা করেছিল—জীবিত অথবা মৃত যে কোনো অবস্থায় রাসবিহারী বসুকে ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সেদিন এই দামই ধার্য হয়েছিল এই বিপ্লবী বীরের মাথার ওপর। দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ অফিসের হেডক্লার্ক যে স্তূপীকৃত ফাইলের অন্তরালে বিপ্লবের সাধনায় রত ছিলেন, সেটা পুলিশের বড়কর্তারা সেই প্রথম অনুমান করলেন। তাঁরা সর্বত্র এই মানুষটিকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন। জোরালো হয়ে উঠল পুলিশী ব্যবস্থা।

কিন্তু রাসবিহারীকে ধরতে পারা পুলিশের পক্ষে অসাধ্য ছিল। পুলিশের সামনে দিয়েই বিভিন্ন ছদ্মবেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়ে নিজের কাজ করতে থাকেন। কলিকাতায় এসে আত্মগোপন করে থাকার জন্য তিনি অন্ধকার সংকীর্ণ গলির মধ্যে অবস্থিত কোনো একটা পরিত্যক্ত গৃহে আশ্রয় নিতেন ফুলুরী-বেগুনীভাজা বিক্রেতারূপে অথবা কাটা ফল-বিক্রেতারূপে। ধর্মতলা পোস্ট অফিসের উপরতলার ঘর ভাড়া করে সেখানে থেকেছেন। স্থানটা যে কত বেশি জনবহুল ও কর্মচঞ্চল তা কলিকাতা সম্পর্কে পরিচিত লোক মাত্রেই অবগত আছেন। ঠিক এই রকমই সম্পূর্ণ ভাবে লাহোর একবার ঘিরে রাখা হয়েছে রাসবিহারীকে ধরবার জন্য। তিনি ছদ্মবেশে বেরিয়ে এলেন সেই ঘেরাটোপ থেকে। ট্রেনে যে কামরায় উঠলেন, দেখেন সেখানে ঐ এলাকার পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা এবং সামরিক বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারও রয়েছেন। নির্ভীক রাসবিহারী তাঁদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতে করতে কাশী এলেন। তাঁরা জানতেও পারলেন না যে পুলিশের অন্বেষিত একজন বিখ্যাত ফেরারী আসামীর সঙ্গে তাঁরা এতখানি দূর পথ ভ্রমণ করলেন।

এই ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষমতাই শেষপর্যন্ত তাঁকে ভারত ত্যাগ করে জাপান যেতে সহায়তা করেছিল। শুধু কি ছদ্মবেশ? যে কয়েক বছর তিনি এই দেশে বৈপ্লবিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় একাধিক নামে তিনি চলাফেরা করতেন এবং জাপান যাওয়ার সময়েও তিনি একটি ভিন্ন নাম গ্রহণ করেছিলেন, যেমন করেছিলেন তাঁর অন্যতম সহকর্মী মানবেন্দ্রনাথ রায় বাটাভিয়া যাওয়ার সময়। ছদ্মবেশ ধারণে ইনিও দক্ষ ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবনের শেষপর্বে আমরা দেখেছি যে তিনিও ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে (সে নামও ছিল একাধিক) ভারত ত্যাগ করে বার্লিন চলে গিয়েছিলেন। বিপ্লবী জীবনের এটি একটি বিশেষ রীতি। রাসবিহারী যে দীর্ঘকাল যাবৎ পুলিশের সন্দেহভাজন ছিলেন না, তার কারণ বোধ হয় তাঁর এই ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম। আমরা জানি তিনি দেরাদুনে এসেছিলেন বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রসারিত করবার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই ফরেস্ট রিসার্চ অফিসের এই ভালো মানুষটি তলে তলে অতি গোপনে যে বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত আছেন সে সংবাদ কেউ কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও জানত না। জানলে পরে কি আর ডেনহ্যাম তাঁকে ডেকে তাঁর ওপর চন্দননগরে বিপ্লবীদের যে দলটি কাজ করছিল তাদের সম্পর্কে তদন্তের ভার দিতেন?

নানা সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে আজ জানতে পারা গিয়েছে যে, ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে ছদ্মবেশ ধারণে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। ছদ্মবেশ ধারণে দক্ষ স্যর চার্লস টেগার্ট স্বয়ং এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, "Expert in make up, Rashbehari Bose could dress up himself either as a Punjabi, or as a Gujarati or even as an old Maharastrian in such a perfect manner that it was impossible to suspect

him as one in disguiese. He would have been a great stage actor instead of a revolutionary if he so desired." এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আরো সত্য এই যে, যখন যে রূপ ধারণ করেছেন তখন সেই রূপটাই যেন রাসবিহারীর পক্ষে সবচেয়ে সত্য হয়ে উঠেছে। তাঁর সহকর্মী ও সতীর্থগণের মধ্যেও তিনি ছদ্মবেশ ও ছদ্মনামে পরিচিতি ছিলেন। ছদ্মনামও ছিল অসংখ্য। একবার বাঘা যতীন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা রাসু, তোমার কতগুলো ছদ্মনাম আছে ? পরিহাস করে উত্তর দিয়ে তিনি বলেছিলেন—আমার নাম রাসবিহারী, এটা শ্রীকৃষ্ণের নাম। এই পুরুষোত্তম মানুষটির ছিল একশো আটটি নাম। আমার namesake তিনি, তাই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মাত্র গোটা দশ-বারো নামে আমি এ পর্যন্ত পরিচিত, শেষ পর্যন্ত আর কি নাম গ্রহণ করতে হবে তা ঈশ্বর জানেন। তবে শুনেছি, 'সতিন্দর চন্দার' ও 'ফ্যাটবাবু'—এই দুটো নাম উত্তর-ভারতে এবং পাঞ্জাবে 'দরবারা সিং'—তাঁর সম্পর্কে এই তিনটি নাম বেশি প্রচলিত ছিল।

তাঁর ছদ্মনামের দাপট এমন ছিল যে, তাঁর অনুগামী ও সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই রাসবিহারীর প্রকৃত নাম যে কি তা জানতেন না। পুলিশের কাছে ব্যাপারটা ছিল আরো রহস্যজনক। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মুরারীপুকুর বাগানে হানা দিয়ে পুলিশ অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে রাসবিহারী বসুর লেখা দু'খানি পত্র পায়। ঐ চিঠি দুটি নিয়ে পুলিশ খুবই বিব্রত হয়ে পড়ে। কারণ এই 'রাসবিহারী বসু' নামক ব্যক্তিটির identity তাদের জানা ছিল না। গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তরে এই নামের সন্দেহভাজন কোনো লোকের পরিচয় জানা ছিল না। তাই তাঁর জাপান যাওয়ার আগে পর্যন্ত পুলিশ আবিষ্কারই করতে পারেনি যে, রাসবিহারী বসু মানুষটি কে ?

"The bomb at Delhi was a protest, the signal and

Dehradun was an assurance that the ptotest had not died with the bomb." তাই দেখা যায় যে, চাঁদনীচকে বোমা নিক্ষেপের পর রাসবিহারী ব্যাপকভাবে আবার সংগঠন কাজে মেতে উঠলেন। ইতিহাসে তাঁকে দুটি সশস্ত্র বিপ্লবের জনক বলা হয়েছে। এর প্রথমটি ছিল ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করা আর দ্বিতীয়টি ছিল ভারতের বাইরে ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদল গঠন। প্রথমটি ব্যর্থ হয়, দ্বিতীয়টি সার্থক হয়। প্রথমটির ইতিহাস সংক্ষেপে এই রকম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতে যে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়, বিপ্লবী নায়করা তার সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য একটা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এর একাংশের নেতৃত্ব করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর অপরাংশের নেতৃত্ব করেছিলেন রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের কথা পরে বলব, তার আগে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিযানের কথা উল্লেখ করতে হয়। রাসবিহারীর জীবনের এই পর্বের ইতিহাস আলোচনায় বাঘা যতীনের প্রয়াসের উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য। ভারতের মুক্তি-সাধকদের মধ্যে ইনিও অগ্রগণ্য ছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর স্মৃতিকথার (M. N. Roy's Memoirs) প্রারম্ভেই লিখেছেন: "১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে পরে য়ুরোপে নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীগণের দৃষ্টি নিপতিত হয় জার্মানীর উপর। তাঁদের আশা ছিল যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মানি অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করবে। এই আশা নিয়েই তাঁদের অনেকে বার্লিনে গিয়েছিলেন। ঐ বছরের শেষভাগেই ভারতে সংবাদ পৌঁছল যে, বার্লিনস্থ ভারতীয় বিপ্লবী কমিটি জার্মান সর-কারের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যে, স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে যে পরিমাণ অস্ত্র ও অর্থের প্রয়োজন তা তাঁরা দেবেন। এই সংবাদ অবগত হওয়ার

অব্যবহিত পরেই ভারতের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি ঐক্যবদ্ধ হয় ও তাদের মধ্যে এতকাল যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কলহ চলে আসছিল তার অবসান ঘটে। এই সময়ে বিপ্লবীদের মধ্যে একাধিক গোপন বৈঠক হয় এবং এই বৈঠকে আসন্ন সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে চূড়ান্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে একটি General Staff গঠিত হয়; এরই অধিনায়ক বা কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন যতীন মুখার্জি বা যতীনদা। ইনি ছিলেন আমার বিপ্লবীজীবনের গুরু।"

বার্লিনে যে ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সরকারী নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স কমিটি'। কয়েকজন বর্ষীয়াণ ব্যক্তি নিয়ে এই কমিটি স্থাপিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে দেওয়া আছে। তিনি এই কমিটির একজন সেক্রেটারী ছিলেন। এদেশের বিপ্লবীরা কেন বাইরের সাহায্য গ্রহণ করতে গেলেন? এই প্রশ্নের একটা উত্তর দিয়েছেন ডক্টর দত্ত। তিনি লিখেছেন: "ভারতীয় বৈপ্লবিকদের জার্মান সাহায্য গ্রহণ সমীচীন হইয়াছিল কিনা, এই প্রশ্ন যুদ্ধের পরে উত্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু বৈপ্লবিকেরা ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত দেখান যে, পৃথিবীর সর্বত্রই নিপীড়িত জাতি শাসকের শত্রুর সাহায্যলাভ করিয়াছে। তাহাদের মতে রাজনৈতিক হিসাবে ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। এই সুযোগ যদি তাঁহারা গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের মূর্খতা ও অনুপযোগীতারই পরিচয় প্রকাশ হইত। যুদ্ধসময়ে মিত্রশক্তি সমূহের (Allied Powers) শাসনে নিপীড়িত জাতিসকল জার্মানির দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং মধ্য শক্তিসমূহের (Central Powers) দ্বারা প্রপীড়িত জাতিরা মিত্রশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল।......জার্মান সাহায্য যখন অঙ্গীকৃত হইল তখন সেই সাহায্য ভারতের ও বাহিরের সকল বৈপ্লবিকই সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা

স্পৃহার সহিত তাহাদের সহানুভূতি আছে বলিয়া জার্মান গভর্নেমণ্ট প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন।”

ভারতের বাইরে য়ুরোপে সে সময়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা বিবিধ বৈপ্লবিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে অনেকেরই নাম-ধাম আমাদের দেশের নেতাদের কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু এঁদের কার্যকলাপের ফলেই যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় বিরচিত হইয়াছে, সে কথা আজ কে অস্বীকার করবে? আমাদের নেতারা যখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের দরজায় আবেদন ও নিবেদনের থালা নিয়ে অনুনয় বিনয় করার মধ্যে রাজনৈতিক সার্থকতা খুঁজতেন, তখন এই অখ্যাত অজ্ঞাত নির্বাসিত যুবকেরাই দেখিয়েছিলেন যে, ভারতীয়েরা পরাধীন অবস্থাতেও অন্য বৈদেশিক সরকারের কাছে সমানভাবে আদৃত হতে পারে। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরো দেখিয়েছেন যে ঐ অবস্থায় অন্য পরাক্রান্ত সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনও করা যেতে পারে। বস্তুত তাঁরা তাই-ই করেছিলেন। ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয় যে, “যখন দেশের নেতারা কূপমণ্ডুকের ন্যায় ভারতীয় রাজনীতিকে কংগ্রেসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, সেই সময়ে এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবকেরা ভারতের রাজনীতিকে জগতের সম্মুখে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের বৈদেশিক কূটনীতি (Foreign diplomacy) স্থাপনের অগ্রদূত।”

যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী ১৯১৫ সনে যে বৈপ্লবিক প্রয়াস পেয়েছিলেন অর্থাৎ সোজা কথায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করেছিলেন সেটা বার্লিনে ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি প্রতিষ্ঠিত না হলে যে আদৌ সম্ভব হতো না, সে কথা ডক্টর দত্ত তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে পরিষ্কারভাবেই অলোচনা করেছেন। এই সব বিপ্লবীদের অনেকেই সাহসে

ভর করে দেশ-দেশান্তরে গিয়েছেন, বিনা পাশপোর্টে ছদ্মবেশে সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছেন। জিব্রাল্টারের পথ দিয়ে য়ুরোপে এসেছেন। সে পথ বন্ধ হলে ব্রিটেনের মাথা ডিঙিয়ে বার্লিনে উপস্থিত হয়েছেন, আবার স্বদেশে ফিরেও গিয়েছেন। এই মানসিক শক্তি নিয়েই বৈপ্লবিক যুবকের দল সেদিন ভারতের বাইরে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন নিঃশঙ্ক-হৃদয়। এঁদের মৃত্যুভয় ছিল না।

বার্লিন কমিটি সংস্থাপন ও জার্মান সাহায্যের প্রতিশ্রুতির সংবাদ যখন বাংলা দেশে এসে পৌঁছল তখন এখানকার বিপ্লবীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এমনি প্রতিশ্রুতির বার্তা আমেরিকা থেকেও এসেছিল। সিডিশন কমিটির (রৌলট রিপোর্ট) রিপোর্টে বাংলায় জার্মান ষড়যন্ত্রের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তবে এই বিবরণের মধ্যে শুধু যে তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তি আছে তা নয়, তথ্য-বিকৃতিও আছে। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থের শেষভাগে লিখেছেন: "আমরা ঠিক বুঝেছিলাম, বিপ্লব আন্দোলনে তিনটি শক্তির খেলা অবশ্য প্রয়োজনীয়। একটি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, একটি বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা এবং একটি সেনানায়ক ফুটে উঠবেন সেই অদৃশ্য শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে।...শ্রীঅরবিন্দকে মনে হোত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, টিলককে ধুরন্ধর রাষ্ট্রনেতা। গ্যারিবল্ডির অভ্যুদয় হোল যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির মধ্যে দিয়ে। এক প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বালেশ্বরের চাষাখন্দের যুদ্ধে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ এক সেনানায়ক-রূপে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে শিখিয়ে গেলেন।"

যতীন্দ্রনাথের জীবন বা চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু বলার অবকাশ এখানে নেই। সেই মহান বিপ্লবীনায়কের চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ অল্প কথায় যা বলেছেন তার বেশি আর কেউ বলতে পারেন বলে আমার ধারণা হয় না। তিনি লিখেছেন:

"Jatin Mukherjee—a wonderful man! He was a man who would belong to the front rank of humanity anywhere; such beauty and strength combined together I have not seen and his stature was like that of an warrior." যোদ্ধাই বটে! যোদ্ধার আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ, সেই অকুতোভয় দেশপ্রেমিক তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে (১৮৮০-১৯১৫) বিপ্লবের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন তার তুলনা হয় না। বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে এই বিপ্লবী নায়কের জীবনদানের মহিমা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে অধ্যায় রচনা করে গিয়েছে, মহাকালের হস্তাবলেপেও তা কোনো দিন মুছে যাবার নয়।

কথিত আছে, পণ্ডিচেরী যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীঅরবিন্দ বাংলার বিপ্লবীদের জন্য একটিমাত্র নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন—"Follow Jatin."—অর্থাৎ তাঁরা যেন যতীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন ও তাঁর দেশব্যাপী বৈপ্লবিক প্রয়াসে সহায়তা করেন। এ নির্দেশ বৃথা যায় নি। এ হোল ১৯১০ সনের কথা। এর চার বছর পরেই বাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যতীন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁর সহকর্মীদের প্রায়ই একটি কথা বলতেন—"Their danger is our opportunity." বলতেন: "বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ যখন জড়িয়ে পড়বে, তখন ভারতের ওপর তার মুঠোর জোর কমে আসবে।" ঠিক এই ধরনের কথা ঐ সময়ে রাসবিহারীকেও আমরা বলতে শুনেছি, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকেও আমরা তাই বলতে শুনেছি। তারপর যখন জার্মান প্রতিশ্রুতির খবর এল তখন যতীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা শতগুণে বৃদ্ধি পেল। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বড়ো রকমের strategist এবং তাঁর এই সময়কার কার্যাবলী তারই অভ্রান্ত নিদর্শন বহন করে। শ্রমজীবী সমবায় তো আগে থেকেই ছিল।

১৯১১ সনে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঐ জাতীয় আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। নিজে যশোহরে গিয়ে কিছুকাল একটা ঠিকাদারী ব্যবসায়ে রত হন। এটা ছিল তাঁর পুলিশের চক্ষে ধূলো দেওয়ার একটা camouflage বা কৌশল। যশোহর ভিন্ন তাঁর এই ঠিকাদারী ব্যবসার কয়েকটি শাখা অন্যত্রও খোলা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি কর্মীদের নিযুক্ত করলেন এবং এই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি বালেশ্বরে 'ইউনিভার্সাল এম্‌পোরিয়াম' নামে একটি সাইকেল ও ঘড়ির দোকান খুলেছিলেন। এইসব ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিল বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ও মিলন-কেন্দ্র।

১৯১৪। জুলাই মাস। য়ুরোপে বাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আগস্ট মাসে কলিকাতায় রডা কোম্পানীর বন্দুকের দোকান লুট হলো। এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখলের পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন এবং এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য যে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি রাসবিহারী, তেমন অভিমতও তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। রডা কোম্পানীর দোকান লুট করে জার্মানিতে তৈরী কয়েক শত আগ্নেয়াস্ত্র সংগৃহীত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি বিপ্লবীদলের বিভিন্ন কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯১৫ সনের মার্চ মাসে যতীন্দ্রনাথের অন্যতম সহকর্মী জিতেন লাহিড়ী ফিরলেন আমেরিকা থেকে। তাঁর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ভারতের বৈপ্লবিক প্রয়াসকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাই হয়ে আসছে তিনটি জাহাজ এবং এই তিনটি জাহাজের মধ্যে জার্মান জাহাজ S. S. Movarick সানফ্রানসিসকো থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করবে ২২শে এপ্রিল। এখানে উল্লেখ্য যে, বার্লিন কমিটিই জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁদের সেই অনুরোধ ব্যর্থ হয় নি। কিছুদিন পরে খবর এলো আরো

একটা জার্মান জাহাজ বোঝাই হয়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রসম্ভার যাত্রা করেছে ভারত অভিমুখে এবং উড়িষ্যার সমুদ্রাঞ্চলের কোথাও সেই জাহাজ নোঙর করবে।

এই শেষোক্ত জাহাজ থেকেই অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার ভার নিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন ১৯১৫ সনের মার্চ মাসের শেষের দিকে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন রাসবিহারী বসুর মতো বাংলাদেশের পুলিশ যতীন্দ্রনাথের মাথার উপরও উচ্চ মূল্য ঘোষণা করে রেখেছিলেন। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি ছিল তাঁর গতিবিধির উপর, কিন্তু তাঁর অবস্থানের সঠিক সংবাদ জানা তাদের সাধ্যাতীত ছিল, এমনই সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি চলাফেরা করতেন। তথাপি কোনো এক সূত্র ধরে চার্লস টেগার্ট (ইনি তখন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ছিলেন) ও পুলিশ বিভাগের আরো দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বালেশ্বর যাত্রা করেন এর পাঁচ-ছয় মাস পরে। ডেনহ্যাম সাহেব বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এম্‌পোরিয়ামে হানা দিয়ে একটা কাগজের টুকরো পান। তাতে কপ্তিপদার নাম ছিল। পুলিশ-বাহিনী চলল কপ্তিপদার অভিমুখে এবং তাদের সঙ্গে চলল বালেশ্বরের একদল সশস্ত্র পুলিশ। যতীন্দ্রনাথ সেখানে 'সাধুবাবা' এই নামে পরিচিত ছিলেন; পরতেন গেরুয়া আর গ্রামবাসীদের বিপদে-আপদে সর্বপ্রকার সাহায্য করতেন। নিরক্ষরদেরও পড়াতেন। সে আশ্রম দেখে বুঝবার উপায় ছিল না যে সেখানে সেই গৈরিকবস্ত্রের আড়ালে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পুলিশবাহিনীর আগমনের বার্তা পূর্বাহ্ণেই তাঁর কাছে লোক মারফৎ পৌঁছে যায়। মনোরঞ্জন সেন, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাসগুপ্ত, ও যতীশ পাল সহ যতীন্দ্রনাথ থাকতেন এই আশ্রমে। খবর পাওয়া মাত্র, যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে আশ্রম থেকে

নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন বুড়িবালামের তীরে। এ-ঘটনা ৭ই সেপ্টেম্বরের। এক সপ্তাহ ধবে চলেছিল তাঁদের অনুসন্ধান ম্যাজিস্ট্রেট কিলবির তত্ত্বাবধানে আর লেফটেন্যান্ট রাদারফোর্ডের নেতৃত্বে' পরবর্তী কাহিনী সুপরিচিত। বালেশ্বরের সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়, তলপেটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ (১০ই সেপ্টেম্বব)। বিচারের পরে বালেশ্বর জেলে ফাঁসীকাঠে প্রাণ দিলেন নীবেন ও মনোরঞ্জন আর যতীশ পালের হয় যাবজ্জীবন দীপান্তব। বুড়িবালামের তীরে চষাখণ্ডে এইভাবে সেদিন বিরচিত হয়েছিল নব-ভারতের হলদিঘাট।

বালেশ্বরের যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের আত্মদান সম্পর্কে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "সেদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে ভারতের অকুতোভয় বিপ্লবী-আত্মার অর্ঘ্য দেশমায়ের পায়ে এমনি করে লুটিয়ে পড়েছিল। তারাই প্রথম পথ দেখিয়ে গেল স্বল্প-শক্তি কেমন করে প্রবল শক্তিকে পাল্টা জবাব দিতে পারে। দেশব্রতী বীরদের পালিয়ে বাঁচার পালা শেষ কবে সম্মুখ-সমরে আত্মাহুতির নতুন পথে দেশের বিদ্রোহী শক্তিকে কি করে বলীয়ান করা যায়, তাই তাঁরা দেখিয়ে যান। স্বাধীনতার যুদ্ধ-যজ্ঞে বালেশ্বরের যুদ্ধ এমন সমিধ জুগিয়েছিল যে, হোমাগ্নি আরো দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। দেশ সেদিন অপূর্ব সমৃদ্ধিতে মহিমান্বিত হলো।"

রাসবিহারীর মতো যতীন্দ্রনাথেব জীবনটাও ছিল গীতার আদর্শে গঠিত। আপন অস্তিত্ব ও মহত্ত্বে উদাসীন ভারতের বিদ্রোহী বীর যতীন্দ্রনাথের আত্মদানে দেশমাতার ললাটের টিকা সেদিন সত্যিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথের এই আত্মদান যাঁর প্রাণে দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছিল তিনি তখন জাপানে। এইবার আমরা সেই রাসবিহারী বসুর ভারত-ত্যাগের পূর্বে ভারতে একটি বৃহত্তম বৈপ্লবিক প্রয়াসের রোমাঞ্চকর কাহিনী উল্লেখ করব।

নয়

আগেই বলেছি ভারতবর্ষে এই যুগে আমরা যে সশস্ত্র বিপ্লববাদের অভ্যুত্থান দেখি তার প্রকৃত সূচনা মহারাষ্ট্রে। এই প্রদেশে ১৮৯৭ সনে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের দরুণ জনসাধারণের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ঐ সময়ে কয়েকটি খেলা বা উৎসবের আয়োজন চলে। 'গণপতি খেলা' ও 'শিবাজী খেলা'-ই এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই দুটিরই প্রবর্তক ছিলেন টিলক। এই খেলার সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন চাপেকার ভ্রাতারা এবং এই উৎসবের বেদী থেকে সেদিন যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা বর্ষিত হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তারই ভিতর দিয়ে ঝঙ্কৃত হয়েছিল ইতিহাসের আগমনী। অনেকেই হয়ত জানেন না যে তখন এই সব বক্তৃতা থেকে যে কয়টি শ্লোগান জন্ম নিয়েছিল, পরবর্তীকালে বাংলা, উত্তরভারত ও পাঞ্জাবে তা ছড়িয়ে পড়েছিল। রাসবিহারী যে এই শ্লোগানগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা তাঁর বহু উক্তি থেকেই জানা যায়। "নিজের হাতে তুলে নিতে হবে অস্ত্র আর বর্ম।" "যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হবে।" "এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ।"—এই তিনটি শ্লোগান পুণা থেকে বাংলায় এসেছিল আর পরে বাংলা থেকে রাসবিহারীর মাধ্যমে উত্তরভারত ও পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা অনুমান করতে পারি যে, ১৯০৬-এর বাংলায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ছেঁদো পথ বর্জন করে বাংলার তরুণরা যে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছিলেন তার প্রেরণা এসেছিল মহারাষ্ট্র থেকেই। হিন্দু-জাতীয়তাবাদ অবশ্য তার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মাধ্যমে এসে গিয়েছে। প্রথম যুগের বিপ্লবীদের সকলেই এই আদর্শ দ্বারা অনেকখানি উদ্বুদ্ধ ছিলেন, বিশেষ করে রাসবিহারী বসু।

তাঁর জীবনের বনিয়াদ এই ছিল বলেই না তিনি তাঁর লক্ষ্যে স্থির ছিলেন—কখনো মত বা পথ কিছুই পরিবর্তন করেন নি। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা বিশেষভাবেই অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু এ আলোচনা এখন থাক, আমরা আমাদের কাহিনীর পূর্বসূত্রে ফিরে যাই। হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র দেশ যে কতদূর উত্তেজিত হয়েছিল তা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায়। বাংলা বিভাগের কার্জনী ষড়যন্ত্র, উচ্চশিক্ষা সংকোচন এবং কার্জন কর্তৃক ভারতের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ—প্রধানত এই তিনটি বিষয় দেশে যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা দেখলাম যে সেই অসন্তোষ ধূমায়িত অবস্থা থেকে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় এসে উপনীত হলো এবং দিল্লীর ঘটনাটা যেন একমুহূর্তে সমগ্র দেশকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করল অথবা বারুদের আগুনের মধ্যে যেন একটি দেশলাই-শলাকা নিক্ষেপ করল। স্যর ভ্যালেন্টিন চিরোল তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান আনরেস্ট' গ্রন্থে এর একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়ে লিখেছেন—"The throwing of a bomb on Viceroy during his State-entry into the new Capital of Delhi had tremendous effect on the subsequent revolutionary upheaval which shook India. The detonation started by Rashbehari Bose did never die away. It was he who planned the second sepoy mutiny which, if it succeeded, would have shattered the British empire in India." এইখানে ভ্যালেন্টিন চিরোল রাসবিহারী পরিকল্পিত যে সিপাহী বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন, এইবার আমরা তাঁর জীবনের সেই দুঃসাহসিক অধ্যায়টি তুলে ধরব।

চাঁদনীচকে বোমা নিক্ষেপের পর রাসবিহারী ব্যাপকভাবে আবার বৈপ্লবিক সংগঠন-কাজে লিপ্ত হলেন। ব্রিটিশ ভারতে তখন ত্রিশ

ডিভিশন সৈন্য ছিল; এর মধ্যে কুড়ি ডিভিশনই ছিল ভারতীয় সিপাহীদের নিয়ে গঠিত। তিনি স্থির করলেন, এইবার এই সৈন্য-দলের মধ্যে বিদ্রোহ করার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলতে হবে যেমন একদিন জাগিয়েছিলেন নানাসাহেব। হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১২। আর তিনি ভারত ত্যাগ করে জাপান চলে যান ১৯১৫ সনের ১২ই মে। হিসাব মতো সেই সময়ে তিনি ভারতে অবস্থান করেছিলেন দু'বছর পাঁচমাস এবং এই সময়ের মধ্যেই তিনি সৈন্যদলে বিদ্রোহ সংগঠনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। "এই অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে তিনি ভারতের ছাব্বিশটি সেনানিবাসে (Cantonment) স্বকীয় অপূর্ব কৌশলে এককালীন বিদ্রোহের সংগঠন ও পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন।" এ সাধারণ প্রতিভার কাজ নয়। এইখানেই আমরা তাঁর মধ্যে যুগপৎ সামরিক কৌশল ও রাজনৈতিক প্রতিভার সমাবেশ দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে 'রাসবিহারী বসু স্মারক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক ও বিগত যুগের বাংলার একজন বিপ্লবী কর্মী শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন প্রথমে আমরা তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম। তিনি লিখেছেন:

"এই সময়ের সহকর্মীদের মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থানের যোজনায় যাঁহারা তাঁহার একান্ত সহকর্মী ছিলেন বর্তমান অমৃতসরের অধিবাসী পণ্ডিত পরমানন্দ ঝাঁসী তাঁহাদের অন্যতম। এই সময়ে চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষায় রাসবিহারী বসু সঙ্গীদের মনে কিরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন একটি উদাহরণেই তাহা লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করিবে অথচ উহা দিবালোকের মত সত্য ঘটনা। ১৯১৪ সনের শেষভাগে রাসবিহারী লাহোরে উপনীত হইলেন। সঙ্গে ছিলেন পিংলে, শচীন সান্যাল ও পরমানন্দ ঝাঁসী। তাঁহারা সহকর্মী রামশরণ

দাসের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। লাহোরে দুইমাস থাকিয়া উত্তর ভারতের সামরিক বিপ্লবের সংগঠন চালাইবেন—ইহাই ছিল অভিপ্রায়। রাসবিহারী তখন সমগ্র ভারতের বিপ্লব পরিকল্পনার জনক, সংগঠক ও মুখ্য নায়ক। কিন্তু লাহোরে পৌঁছিয়া তাঁহারা এক সংবাদে শঙ্কিত হইলেন। লাহোরে সরকারী ঘোষণায় প্রচার করা হইয়াছিল যে সস্ত্রীক না হইলে কাহাকেও বাড়িভাড়া দেওয়ার পূর্বে জেলা কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সংবাদ দিয়া অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই সংবাদে রামশরণ দাসের গৃহে সদলে উপনীত রাসবিহারী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া উপায় উদ্ভাবনের আলোচনায় কালহরণ করিয়াও যখন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না তখন দৈববাণীর আশীর্বাদের মতো এক মহীয়সী মহিলা পথ নির্ধারণ করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। এই মহীয়সী মহিলা বিপ্লবী রামশরণ দাসের স্ত্রী। তিনি সহাস্যে এবং দৃঢ়চিত্তে বলিলেন, চিন্তা কি, বাড়িভাড়া ঠিক কর, আমি বোসজীর স্ত্রীরূপে তাঁর সঙ্গে এক গৃহে যতদিন প্রয়োজন বাস করিব। কার্যত তিনি প্রায় দুইমাস কাল রাসবিহারীর স্ত্রী-পরিচয়ে একত্রে এক গৃহে বাস করিয়াছেন। এই মহীয়সী মহিলাই স্বহস্তে সমর-পতাকা তৈয়ার করিয়া ১৯১৫ সনের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ব্যবহারের জন্য রাসবিহারীর হস্তে দেন।"

কী ধাতু দিয়ে এই বিপ্লবী নায়কের চরিত্র গঠিত ছিল, তা বুঝবার পক্ষে বোধ হয় এই একটিমাত্র ঘটনাই যথেষ্ট। এই চারিত্রিক কাঠিন্যই যেন তাঁকে দুর্ভেদ্য বর্মের মতো সর্বদা ঘিরে থাকত। যদি প্রশ্ন করা হয়—এই শিক্ষা তিনি পেলেন কোথা থেকে? এর উত্তরে বলব—অরবিন্দের চরিত্র থেকে। শুধু রাসবিহারী নন, যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ তৎকালীন সকল বিপ্লবীদের সামনেই অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টান্তটা খুব কার্যকরী হয়েছিল। সেই অগ্নিযুগ আর ফিরে আসবে না।

মাথার উপর 'জীবিত-মৃতের' ঘোষণাপত্র প্রলম্বিত থাকতেও এই

সময়টা রাসবিহারী তীক্ষ্ণচক্ষু শাসক ও গুপ্তচরের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। এই সময়ে তাঁর সহচরদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; যথা—বিষ্ণু, গণেশ আর পিংলে। উদ্দীপ্ত যৌবনমূর্তির মতো এই তিনজন নির্ভীক সহচর ছিলেন তাঁর 'বডিগার্ড' বা দেহরক্ষী। "যতদিন এই ত্রিমূর্তি আমাকে ঘিরে থাকবে ততদিন পুলিশের সাধ্য নেই রাসবিহারী বসুর কেশাগ্র স্পর্শ করে।" —এই কথা তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন বাঘা যতীনকে। ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত—এই দশমাসকাল তিনি কাশীতে অবস্থান করেছিলেন মিশ্রি পোখবার একটি বাড়িতে। সেই বাড়িটি ছিল একটি ছাপাখানার পিছনে। ছাপাখানাটির নাম ছিল যোগেশ্বর প্রেস। তখন এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের অবাধ আনাগোনা ছিল। বালেশ্বর অভিযানের পূর্বে বাঘা যতীনও এইখানে কয়েকবার এসেছেন বলে জানা যায়। বিপদে অকুতোভয় এই দুই বিপ্লবী নেতা তখন ভাবতে সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে বহু আলোচনা করতেন। সে-সব আলোচনার কোনো রেকর্ড নেই। যদি থাকত তাহলে তাঁদের তৎকালীন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার একটা সুস্পষ্ট রেখাচিত্র আমরা পেতাম। লেনিন বলেছেন যে, বিপ্লবকে সৃষ্টি করতে হয় না, বিপ্লব আপনি আসে। যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী দু'জনেই কিন্তু ঠিক এর বিপরীত মত প্রকাশ করে গিয়েছেন। এঁরা বলতেন, বিপ্লব জন্মায় না, বিপ্লবকে নিজের মনে উপলব্ধি করে সৃষ্টি করতে হয়। দু'জনেই এর অভ্রান্ত পরিচয় রেখে গেছেন তাঁদের কর্মের স্ব স্ব ক্ষেত্রে। অবশ্য ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তির ইচ্ছাই এই বিপ্লবকে সৃষ্টি করেছিল, চালিত করেছিল।

রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লব ঘটাবার প্রসঙ্গে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস'

গ্রন্থে নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত যে বিবরণটি সন্নিবেশিত হয়েছে তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো। তিনি লিখেছেনঃ "১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে জার্মানী এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। ঈপ্সিত মুহূর্ত অবশেষে প্রকট হয়। আমরাও ওই সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইলাম। জার্মান গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে অস্ত্র প্রেরণের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সর্বত্র সশস্ত্র বিপ্লব করিবার পরিকল্পা চলিতে লাগিল। আমরা ইংরেজ গভর্নমেণ্টের প্রত্যেক পদক্ষেপ তীক্ষ্ণরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।...এই সময়ে ভারতীয় সৈন্যদলও গভর্নমেণ্ট তাহাদের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হয়। বিপ্লবীরা এই সুবিধা গ্রহণ করিতে থাকেন। তাঁহারা ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার জন্য একটি সৈন্যদলকে এই উদ্দেশ্যে প্রচার কর্মে নিযুক্ত করেন। বেশিরভাগ ভারতীয় সৈন্যরা এই প্রচেষ্টায় প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

"রাসবিহারী বসু সৈন্যদের মধ্যে প্রেরণা দান করিতে থাকেন। একটি জরুরী সভায় ভারতের বিভিন্ন উপদলের নেতাদের আহ্বান করা হয়। কাশীতে এই সভার অধিবেশন হয়। যে-সব বিশিষ্ট কর্মী এই সভায় যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তসমিতির তরুণ কর্মী শ্রী পিংলে, রাজপুতনার গুপ্তসমিতির নেতা শ্রী প্রতাপ সিংহ, বেরিলির নেতা শ্রী দামোদর স্বরূপ শেঠ ও পূর্ববঙ্গের বৈপ্লবিক নেতা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইহা ব্যতীত অমৃতসর, লাহোর, দিল্লী, কানপুর, আজমীর এবং বাঁকীপুর হইতে নেতারা ঐ সভার কার্যে যোগদান করেন। একটা সাময়িক কর্মপদ্ধতি ঐ সভায় গৃহীত হয়। দলের নিকট হইতে নির্দেশপ্রাপ্ত হইয়া কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে সৈন্যদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় যোগদান করাইবার ইচ্ছায় তাহাদের দলে আকর্ষণ করণার্থ প্রেরিত হন। সর্বত্রই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। সর্বত্রই

জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন জমাদার ও সুবেদারগণ আমাদের উদ্যমের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৈপ্লবিক উত্থানের দিন ধার্য হয়। ঠিক হয় বিদ্রোহ প্রথমে লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে আরম্ভ হইবে।

"ইহা স্থির ছিল যে, রাসবিহারী এবং পিংলে লাহোরের বিদ্রোহ পরিচালনা করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একজন জমাদার (কৃপাল-সিং) বিশ্বাসঘাতকতা করেন। রাসবিহারী ইহা জানিতে পারেন এবং এই বিশ্বাসঘাতককে গুলি করার চেষ্টা হয়। কিন্তু তিনি পলাইয়া যান। ২৩শে তারিখে অর্থাৎ বৈপ্লবিক উত্থানের চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে, একটি বোমাসমেত পিংলে ব্যারাকে ধৃত হন এবং পরে ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন করেন। রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তিনি বিনায়ক রাও-এর সাহায্যে কাশীতে পলাইয়া যান।"

তখন থেকেই আরম্ভ হয় রাসবিহারীর পলাতক জীবন। যে বিনায়ক রাও-র সহায়তায় তিনি কাশীতে পালিয়ে এসেছিলেন, সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-যুবক এতকাল তাঁর নেতার পাশে ছায়ার মতো থেকে তাঁকে কর্মে সহায়তা করেছিলেন, অবশেষে তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে এবং তিনি রাসবিহারীকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই বিশ্বাসঘাতককে বিপ্লবীরা ক্ষমা করেন নি ; লক্ষ্ণৌতে প্রকাশ্য রাজপথে দিবালোকে তাঁকে গুলি করে মারা হয়। এই সময়ে সারা ভারতে ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় আরম্ভ হয় ও পরপর তিনটি ষড়যন্ত্র মামলার (লাহোর, দিল্লী ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা) উদ্ভব হয়। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার ধৃত বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। এঁর সম্পর্কে নলিনীমোহন লিখেছেন :

"শচীন্দ্রনাথ সান্যাল রাজনৈতিক বিপ্লবের সংগঠন ও সংগ্রামের ব্যাপারে সত্যই রাসবিহারী বসুর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। বিপ্লবী নেতারূপে শচীন্দ্রের মধ্যে অনেক অসাধারণ গুণাবলী ছিল। রাস-

বিহারী দাদাকে যদি আমাদের দলের 'মস্তিষ্ক' বলা হয়, তাহা হইলে শচীনকে আমাদের দলের 'হৃদয়' বলা উচিত। বিপ্লবের ব্যাপারে তিনি যে অসাধারণ নেতৃত্ব ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা শুধু পৃথিবীর ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বিভিন্ন স্বাধীনতাযুদ্ধের সুবিখ্যাত নেতাদের শক্তির সহিতই তুলনা হইতে পারে।" ১৯৪০ সনে গোরক্ষপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুশংকাহীন এই দুর্জয় জীবন চিরকাল আমাদের কাছে দেশসেবার প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

বিপ্লব-প্রয়াস এইভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। ভারতে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ সূচনাতেই বার্থ হয়ে গেল। তখন সারা ভারত তোলপাড় করে পুলিশ বিদ্রোহেব মূল নায়ক রাসবিহারীকে ধরবার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করল। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-বি ও ৩০২ ধারামতে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। "কিন্তু দেবাদুন ফরেস্ট রিসার্চ অফিসের হেড ক্লার্ককে পাওয়া গেল না। তিনি নাকি ছুটিতে আছেন। ঘোষণাপত্রে তাঁকে ওরফে বিনোদ-বিহারী বসু বলা হলো। বলা হলো বয়স হবে ত্রিশ, গায়ের রঙ ফর্সা, দীর্ঘকায়, আয়তচক্ষু, ডান হাতের একটি আঙ্গুলে কোনো দুর্ঘটনার চিহ্ন বর্তমান। সারা ভারত তোলপাড়। সারা ভারতেই পড়ল জাল। মরিয়া হয়ে পুলিশ ছুটল চারদিকে। নেই, নেই, কোথাও নেই ঐ উদ্দিষ্ট ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কোটি চক্ষু বিস্ফারিত ঐ একটি লোকের সন্ধানে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষ আর নিরাপদ নয়।"

সহকর্মীরা অনুরোধ করেন তাকে অবিলম্বে দেশত্যাগ করবার জন্য। বলেন, দাদা, এদেশে থাকা তো আপনার পক্ষে আর নিরাপদ নয়।

—সেটা তো বেশ বুঝতে পারছি।

—তাহলে আর দেরী করবেন না। আপনার গতিবিধির ওপর

ওরা কড়া নজর রেখেছে, কাশীর সকল মহল্লায় গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনার সন্ধানে।

—সে তো জানি ; সেইজন্যই তো আমি নিত্য নূতন ছদ্মবেশে রইছি।

—কিন্তু এইভাবে আত্মগোপন করে থাকবেন কতদিন ? বরং বাইরে যেতে পারলে আপনার 'মিশন' সার্থক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অতঃপর রাসবিহারী কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। সমস্ত মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। কি যেন তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ; পশ্চিম আকাশে দিনের সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের সেই রক্তিম আভার সৌন্দর্য কি তিনি দেখছিলেন ? না, তা তিনি দেখছিলেন না। তাঁর দুই চক্ষের দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ হলেও, বোঝা গেল যে বিপ্লবীনায়কের সেই অপলক দৃষ্টি ভারত-ইতিহাসের অতীতের পৃষ্ঠায় বিচরণ করছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর সহকর্মীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন :

—এত যত্ন করে প্ল্যানটা করলাম একটা বিশ্বাসঘাতকের বেইমানিতে আমার সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে গেল। কৃপাল সিং যে এমন করবে, এ আমার ধারণাই ছিল না। এইটাই বোধ হয় এই জাতির দুর্ভাগ্য।

—কিন্তু দাদা, গতস্য শোচনা নাস্তি। শুধু যে আপনার প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল তা নয়, আমাদের দলের কত লোক ধরা পড়ল, ফাঁসিকাঠে ঝুলল, দ্বীপান্তরে গেল।

—আমি কিন্তু চির আশাবাদী। বিপ্লবী কখনো 'পেসিমিস্ট' হয় না। যাব, আমি ভারতের বাইরেই যাব এবং যেখানে থাকব সেখান থেকেই আমার সংকল্প সিদ্ধ করব। আর ফিরব কিনা জানি না।

—নিশ্চয়ই ফিরবেন। যে আগুন দেশে জ্বালিয়ে গেলেন আপনারা, এ কি সহজে নিভবে?

—তা নিভবে না। অন্তত ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এর জের চলবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, কিন্তু সেদিন হয়ত আমি দেখে যেতে পারব না। না দেখতে পাই, ক্ষতি নেই। এই দেশে এই কয় বছর তো অন্ধকারেই কাটিয়ে গেলাম। রাসবিহারী বসুর কথা ক'জন লোকই বা জানে, আর ক'জনেই বা জানে দেশের স্বাধীনতার জন্য সে কিভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিল। বিদায়ের ক্ষণে আজ তোমাদের কাছে আমি শুধু একটি অনুরোধ করে যাই।

—অনুরোধ নয় দাদা, বলুন আদেশ। আপনি আমাদের নায়ক, নেতা।

—নেতা নই, ভাই। নেতৃত্বেব অভিমান আমার মধ্যে কোনো-দিনই ছিল না, আজো নেই। আমাদের সকলের শুধু একটি পরিচয় আছে—আমরা বিপ্লবী, আমরা সবাই মায়ের মুক্তিফৌজ, আমরা আনন্দমঠের সন্তান। জন্ম থেকেই আমরা দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত।

—কিন্তু কি কথা যেন বলছিলেন আপনি?

—হ্যাঁ। সেইটা বলে যাই তোমাদের। রাসবিহারী বসু একদিন মরে যাবে। শুধু থাকবে তার স্মৃতি, তার নাম। কালে হয়ত সে স্মৃতিও ম্লান হয়ে যাবে, সে নামও অবলুপ্ত হবে। কিন্তু আমাদের উত্তরপুরুষ যখন জানতে চাইবে রাসবিহারী বসু কে ছিল, তখন তোমরা কি বলবে তাদের?

—বলব ভারতের বিপ্লবী মহানায়ক ছিলেন তিনি।

—না, তা বলবে না। লিখে রাখো যা বলি এবং এইটাই তোমরা দেশের লোকের কাছে প্রচার করবে। বলবে—রাসবিহারী বসু ছিলেন একজন যোদ্ধা। I was a fighter.

এই বলে তিনি নীরব হলেন।

সম্মুখে মণিকর্ণিকার ঘাটের পাষাণ সোপানশ্রেণীর তলদেশ চুম্বন করে কলস্বনে বয়ে চলেছে কাশীতলবাহিনী গঙ্গা। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে সহকর্মীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই বিপ্লবী বীর যখন এইভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, তখন ভবিষ্যতের কত চিন্তা, কত ভাবনা লক্ষ তারার ফুলঝুরির মতো তাঁর অন্তরে উদিত হচ্ছিল, তা একমাত্র তিনিই বুঝলেন আর বুঝলেন তার জীবনদেবতা যাঁর নির্দেশে কৈশোর থেকে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন বিপ্লবের অগ্নিময় পথে।

অবশেষে ঠিক হলো তিনি দেশত্যাগ করে জাপানে যাবেন এবং সেখান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন পরিকল্পনা রচনা করবেন। যতীন্দ্রনাথ আর রাসবিহারী—এই দু'জন বিপ্লবীকে ইংরেজ পুলিশের সাধ্য হয়নি কারাগারে আটক করতে, ইংরেজের আইন এঁদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে নি। সম্মুখ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে যতীন্দ্রনাথ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন আর রাসবিহারী ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে পুলিশের সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে দেশত্যাগ করেন। এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা আধুনিক ভারতবর্ষে সেই প্রথম এবং এরই পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ্য করলাম এই ঘটনার সাতাশ বছর পরে সুভাষচন্দ্রের জীবনে। তাঁর অন্তর্ধান ছিল আরো দুঃসাহসিকতা-পূর্ণ এবং আরো রোমাঞ্চকর।

কিন্তু যাবেন কি করে? সংকল্প সিদ্ধ হওয়ার পথে যে অনেক বাধা। পাশপোর্ট চাই। কেমন করে এ জিনিস সংগ্রহ করবেন? শুধু ইংরেজ সরকার নয়, দেশীয় সামন্ত নৃপতিরা পর্যন্ত সেদিন তাঁদের রাজ্যে ইস্তাহার লটকে দিয়েছিলেন তাঁকে ধরার জন্য। নেপোলিয়নের অভিধানে যেমন 'অসম্ভব' কথাটি ছিল না, তেমনি রাসবিহারীর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই ছিল না। যখন তিনি কাশী থেকে চন্দননগরে এসে জাপান যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন ঠিক সেই সময়ে একদিন সকালে সংবাদপত্রে তিনি জানতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শীঘ্রই জাপান

যাবেন। সংবাদটি পাঠ করা মাত্র তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। কাউকে কিছু না বলে তিনি সেইদিনই কলিকাতায় চলে এলেন।

১৯১৫ সনের মে মাসের এক দুপুরবেলায় কলিকাতার পাশপোর্ট অফিসের সামনে একটি ব্রুহাম গাড়ী এসে থামল। গাড়ি থেকে নামলেন দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথায় একটি শাদা রেশমের পাগড়ি, গায়ে একটি বুক-খোলা দামী কোট, কোটের তলায় শাদা হাই-কলার সার্ট, পরনে সরু কালো পাড় নয়নসুকের ধুতি, পায়ে একটি সোনালি জড়ি বসানো নাগরা, হাতে মালাক্কা বেতের তৈরি একটি লাঠি, লাঠির মাথা ও তলা রূপা দিয়ে বাঁধানো। তাঁর সর্বাঙ্গে একটি রাজকীয় মহিমা। ধীর পদক্ষেপে তিনি সোজা এসে প্রবেশ করলেন অফিসের মধ্যে। সেখানে তখন একজন লালমুখ অফিসার বসে কাজ করছিলেন।

—May I see the Passport Officer? গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি।

—Yes, I am the Passport Officer, please take your seat.

—Thank you. I am kaja P. N. Tagore, poet Tagore's relative.

এই ব্রহ্মাস্ত্রেই কার্যসিদ্ধ হলো। 'টেগোর' এই নামটি শোনা মাত্র ইংরেজ অফিসারটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাতখানা আগন্তুকের দিকে বাড়িয়ে তিনি সসম্ভ্রমে করমর্দন করে বললেন—I am glad to meet you. শিষ্টাচার প্রদর্শনে ইংরেজ জাতের তুলনা নেই। তারপর তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন,—What can I do for you?

—I want a passport for Japan. You must have seen

in the newspaper that Poet Tagore is shortly going to visit Japan. I am going there as his emissary to make the necessary arrangements for his stay there.

পোয়েট টেগোর জাপান যাচ্ছেন, এ সংবাদ অফিসারটিরও জানা ছিল। সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার আগেই পাশপোর্ট অফিসে এই বিষয়ে সংবাদ এসে গিয়েছিল। জাপান তখন মিত্রশক্তির পক্ষে। তাই অফিসারটির মনে বিশেষ কোনো সন্দেহ জাগল না। আগন্তুক তাঁর সঙ্গে পাশপোর্টের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফটো সব ঠিক করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফটোর সঙ্গে তাঁর আকৃতি মিলিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই অফিসারটি রাজা পি. এন টেগোরের নামে একটি পাশপোর্ট তৈরি করে তাঁর হাতে দিয়ে দিলেন। সেটি পকেটে নিয়ে, সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে, তেমনি ধীর পদক্ষেপে আগন্তুক এসে তাঁর ব্রুহামে চাপলেন। মুহূর্তমধ্যে কলিকাতার রাজপথ দিয়ে সেই ব্রুহাম ছুটে চলল ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের দিকে। ঐখানে তখন একটি মেসবাড়িতে বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র ছিল। লালবাজার তার সন্ধান রাখত না।

তখনকার দিনে পাশপোর্ট ছিল, কিন্তু কড়াকড়ি ছিল না, তাই রাসবিহারীর পক্ষে পাশপোর্ট সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাওয়াও তাই সহজে হতে পেরেছিল। তা ছাড়া বহু বিপ্লবী সেই সময়ে বিনা পাশপোর্টেই দেশত্যাগ করে-ছিলেন। শুনেছি, ব্যবস্থামতো তাঁরা যে জাহাজে যাবেন ঠিক হতো, সেই জাহাজ যেখানে নোঙর করা থাকত, সেখানে রাত্রিতে নৌকায় করে নিয়ে গেলে জাহাজের সারেঙরা কিছু অর্থের বিনিময়ে তাঁদের উঠিয়ে নিত।

এই রাজা পি. এন. টেগোর আর কেউ নন—রাসবিহারী বসু। 'রবীন্দ্র-জীবনী' তৃতীয় খণ্ডে কবির দ্বিতীয়বার (১৯২৪) জাপানযাত্রার প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : "১৯১৫ সালে ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে

রাসবিহারী কলিকাতা হইতে 'পি. এন. টেগোর' নাম লইয়া ছদ্মবেশে জাপান পলায়ন করেন ; তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় বলিয়া পাশপোর্ট বাহির করিয়া লন এবং কবির জাপান সফরের অগ্রদূত রূপে যাইতেছেন বলিয়া ঘোষণা করেন।"

এখানে একটি প্রশ্ন আছে। রবীন্দ্রনাথ জাপান যাবেন আর তাঁর অগ্রদূতরূপে রাসবিহারী 'রাজা পি. এন. টেগোর' রূপে পাশ-পোর্ট বের করে জাপান চলে গেলেন ঐ ছদ্মনামে। রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারে যে এই ব্যাপারটি হয়েছিল বা হতে পারে, আমাদের তা মনে হয় না। পাশপোর্টের জন্য যথারীতি দরখাস্ত করতে হয় এবং সেই দরখাস্তের উপর দুইজন বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষর থাকা দরকার। রাসবিহারীর পাশপোর্ট সংক্রান্ত সেই দরখাস্তখানি দেখলে হয়ত জানা যেত কারা তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই এমন কারো স্বাক্ষর ছিল যাঁরা সরকারী মহলে সুপরিচিত। যদিও রবীন্দ্র-জীবনীতে এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় নি, তথাপি আমাদের অনুমান যে রাজা পি. এন. টেগোর, এই ছদ্মনামে রাসবিহারীর জাপান যাত্রা কবির অজ্ঞাত-সারে আদৌ হয়নি। মনে হয় তিনি এই বিষয়টি তখন সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন, এমন কি তাঁর জীবনীকারকেও এই সম্পর্কে কিছু বলেন নি। এই অনুমান করার আরো একটা কারণ আছে। ১৯২৪ সনে কবি যখন দ্বিতীয়বার জাপান গিয়েছিলেন তখন সেখানে তাঁর তত্ত্বাব-ধান করেছিলেন রাসবিহারী ও তিনিও রাসবিহারী পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বাসভবনে এসে এই পলাতক বিপ্লবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন ও একখানি গ্রুপ ফটোও ঐ সময়ে তোলা হয়েছিল তাঁদের সকলকে নিয়ে। বাংলার বিপ্লববাদ সম্পর্কে কবির মনোভাব জানা যায় তাঁর 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতাটির মধ্যে। রাসবিহারী বসুর স্বদেশপ্রেম সম্পর্কেও তিনি নিশ্চয়ই ঐ রকম উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকবেন।

রাসবিহারীর জাপান যাত্রা সম্পর্কে এখন একটি নূতন তথ্য জানা গেছে। 'বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু' স্মারক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাঁর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে লিখেছেন : "বিশ্বস্তসূত্রে শোনা যায় এই পাশপোর্ট সংগ্রহে স্বদেশহিতৈষী স্বনামখ্যাত তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীগিরীশচন্দ্র নাগ মহাশয় (শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের পিতা) তাঁহাকে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিলেন। টোকিওতে একদা বন্ধুদের বলিয়াছিলেন যে পাশপোর্ট আনিতে তিনি নিজেই পুলিশের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন।···ভারতে রাসবিহারীর বিস্ময়কর বৈপ্লবিক কার্যাবলী সংগৃহীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।"

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও আরো একটি কথা উল্লেখ করব। অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যখন অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'পথের দাবী' প্রকাশ করেন, তখন ঐ উপন্যাসের সব্যসাচী চরিত্রটির ধারণা তাঁর কল্পনাপ্রসূত ছিল না। এই বিপ্লবীর চরিত্র তিনি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর চরিত্রের দৃষ্টান্তেই সৃষ্টি করেছিলেন—এ কথা শরৎচন্দ্র স্বয়ং একাধিকবার তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে উল্লেখ করেছিলেন। বাংলার বিপ্লববাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে রাসবিহারী বসুর চরিত্রই তাঁকে সবচেয়ে বেশি করে আকর্ষণ করেছিল। একজন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকের চিন্তা ও কল্পনাকে যিনি উদ্দীপ্ত করতে পারেন, তিনি যে একজন কতবড়ো বিপ্লবী তা বোধ হয় আর বুঝিয়ে না বললেও চলে।

১২ই মে, ১৯১৫।

কলিকাতা বন্দর থেকে ছাড়বে 'সানুকি মারু' জাহাজ। সেই জাহাজের একটি বিশেষ কেবিনের মধ্যে রাজা পি. এন. টেগোর এই নাম নিয়ে জাপান রওনা হলেন রাসবিহারী বসু। কথিত আছে,

যেদিন জাহাজ ছাড়বে, সেদিন টেগার্ট সাহেব স্বয়ং দলবল নিয়ে রাসবিহারীর সন্ধানে ঐ জাহাজে হানা দিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছিলেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন নাকি তাঁকে পি. এন. টেগোরের কেবিনটি সার্চ করতে অনুমতি দেন নি। জাহাজে উঠবার আগে তাঁর এক সহকর্মীকে তিনি এই কয়টি কথা বলে গিয়েছিলেন ঃ "জাপানে যাচ্ছি অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। আমি ভারতের প্রত্যেক যুবক-যুবতীর হাতে অস্ত্র দেব—দেখব ইংরেজ কেমন করে এদেশে থাকে।"

তাঁর জীবনের পরবর্তী কাহিনী প্রমাণ করেছে যে তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। বাংলার বিপ্লবীশ্রেষ্ঠকে বুকে নিয়ে সাগর-তরঙ্গে ভেসে চলল সানুকিমারু জাহাজ। এইবার আমরা দেখব অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে সূর্যোদয়ের দেশে এক নবীন সূর্যের উদয় কেমন করে সম্ভব হয়েছিল।

দশ

রাসবিহারীর বয়স তখন উনত্রিশ বছর যখন তিনি ভারত ত্যাগ করেন। ভারতত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই বিপ্লবী বীরের জীবনের একটি গৌরবময় অধ্যায় শেষ হলো। তাঁর জীবনের পরবর্তী ত্রিশ বৎসর-কাল জাপানে অতিবাহিত হয়েছিল এবং এই জাপানকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে গ্রহণ করেছিলেন। দেশত্যাগ করলেন বটে, কিন্তু এই ত্রিশ বৎসরকাল তিনি বৃথা কালক্ষেপ করে অতিবাহিত করেন নি। দেশের মুক্তির চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক সর্বক্ষণ আলোড়িত হতো অতঃপর জাপানকে কেন্দ্র করে রাসবিহারী কিভাবে তাঁর সংকল্প সিদ্ধ করলেন, এইবার আমরা তাঁর জীবনের সেই গৌরবময় কাহিনী আলোচনা করব। আমরা দেখতে পাব যে, জাপানে বসে তিনি ভারতের পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি গভীরভাবেই নিরীক্ষণ করতেন এবং বিশেষ করে যখন থেকে এ দেশের রাজনীতিতে গান্ধীর অভ্যুদয় হয় তখন থেকে তিনি গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ধারাও পর্যবেক্ষণ করতেন। এমন কি, আন্দামান থেকে মুক্ত হওয়ার পর বিপ্লবী বীর সাভারকারের সঙ্গেও তিনি পত্রের বিনিময় করেছেন। আজ মনে হয়, ১৯১৫ সনে রাসবিহারী বসুর জাপান চলে যাওয়াটা বোধ হয় ইতিহাস-বিধাতার অভিপ্রেত ছিল। কেননা, তিনি জাপানে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ গঠন করেছিলেন বলেই, পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে 'নেতাজী'রূপে সুভাষচন্দ্র বসুর অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত তাঁর জীবনের এই ত্রিশ বৎসকালের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেরই একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় বলে গণ্য হওয়া উচিত।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন : "The life history of Rash-Behari Bose is a thrilling chapter in the history of India's struggle for independence so many pages of which are blotted with tears and blood and deathless deeds." কত বীরের রক্তধারা, কত মায়ের অশ্রুজলে রচিত হয়েছে এই ইতিহাস। আমরা যখন অবগত হই যে, ভারত ত্যাগ করে জাপান চলে গিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি—ব্রিটিশের রোষবহ্নি সেই সূর্যোদয়ের দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, তখন সেই সব কাহিনী পাঠ করে আমরা বুঝতে পারি যে, সমস্ত জীবন ধরে এই বিপ্লবী শুধু একটিমাত্র মন্ত্রই সাধন করে গিয়েছেন—সে মন্ত্র ছিল 'ভারত-মন্ত্র'। ভারতের স্বাধীনতা ছিল তাঁর শৈশবের চিন্তা, কৈশোরের আকুতি, যৌবনের সাধনা আর যৌবনোত্তর কালের একাগ্র স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন, সেই সাধনা তিনি কিভাবে সফল করলেন, সার্থক করলেন, তা জানা যায় তাঁর জীবনের পরবর্তী ত্রিশ বৎসরকালের প্রচেষ্টার ইতিহাস থেকে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে এই ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না কিছুতেই।

কলিকাতা ত্যাগ করে ২২শে মে রাসবিহারী সিঙ্গাপুর এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি টোকিওতে উপনীত হলেন। কোথায় থাকবেন, কার কাছে যাবেন—এসব কিছুই তাঁর জানা ছিল না। অর্থের সম্বলও তেমন ছিল না। তথাপি তিনি বিচলিত হলেন না, নিরুদ্যম হলেন না। তিনি জানতেন, তিনি বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন এবং এও জানতেন যে, "এ তুফান ভারি দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।" ভারতে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, যখন বোধন না হতেই পূজার মঙ্গলঘট ভেঙে গেল, তখন অন্য যে কেউ হলে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়তেন, কিম্বা বৈরাগ্যের পথে চলে যেতেন অথবা সাধু-

সন্ন্যাসী হয়ে জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিতেন। কিন্তু বিপ্লবের অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত রাসবিহারীর প্রতিজ্ঞা ছিল স্বতন্ত্র, চরিত্র ছিল অসাধারণ। তাই আমরা দেখতে পাই যে, পরিকল্পিত সশস্ত্র অভ্যুত্থান যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, নানা প্রদেশে বিপ্লবীরা একে-একে গ্রেপ্তার হলেন, তখনো রাসবিহারী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মতো নৈরাশ্যে বলেন নি : "My mission is over." বরং তিনি এইটাই বলেছিলেন যে, তিনি বিদেশে যাচ্ছেন অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করতে। সেই যে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগের সময় বলেছিলেন—বিদেশে যাচ্ছি অস্ত্র সংগ্রহের জন্য, তখন সেটা যে তাঁর কথার কথা ছিল না, তাঁর জীবনের পরবর্তী ইতিহাসই তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করছে।

রাসবিহারীর জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসরকালের মধ্যে দেখা যায় যে, ১৯১৫ সনের জুন থেকে ১৯১৮ সনের জুলাই পর্যন্ত তাঁর মাথার উপর সব সময় মৃত্যুর খড়্গ উদ্যত ছিল। ১৯১৮ থেকে ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে জাপানের নাগরিকত্ব লাভ পর্যন্ত ইংরেজের গুপ্তচরের যন্ত্রণায় তাঁকে একবার নয়, সতের বার আবাসস্থল পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ১৯২৪ থেকে ১৯৪১ সনের ৮ই ডিসেম্বরে জাপানের যুদ্ধঘোষণা পর্যন্ত রাসবিহারীর রাজনৈতিক প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জীবনের শেষ পর্বে রাসবিহারীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মিলন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বোধ করি একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। দুঃখের বিষয়, নেতাজী অনুরাগী বা অনুগামীরা এই অধ্যায়টির আলোচনায় নেতাজীর কথা বলতে যতটা উচ্ছ্বসিত হন, রাসবিহারী বসুর কথা ঠিক সেই ভাবে বলতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেন। কেন, তা বোঝা যায় না। নেতাজী স্বয়ং যাঁর সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে প্রকাশ্য সভায় যাঁকে, পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতার জনক বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর মহত্ত্বকে এইভাবে লাঘব করবার কোনো হেতু থাকতে পারে না। পৃথিবীতে কে কবে নেতৃত্বের মোহ ত্যাগ

করতে পেরেছেন? এর ব্যতিক্রম বোধ হয় একমাত্র রাসবিহারী বসু, যিনি তাঁর স্বোপার্জিত নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় সুভাষচন্দ্রের হাতে সেদিন তুলে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

যে ত্রিশ বৎসরকাল রাসবিহারী বসু জাপানে অতিবাহিত করেছিলেন তার প্রথম দিকের ইতিহাস জানা যায়, ওদেশে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন একাধিক জাপানীর স্মৃতিচারণ থেকে। ইংরেজী স্মারক গ্রন্থে এঁদের অনেকের রচনা সন্নিবেশিত হওয়ায় তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টির উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত হয়েছে। এই সব রচনার মধ্যে তাঁর শ্বশ্রূমাতা শ্রীমতী কোকো সোমা লিখিত বিবরণ থেকে আমরা অনেক কিছু মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। এই রচনাগুলি থেকে আমরা যথাস্থানে উদ্ধৃতি দিয়ে রাসবিহারীর প্রবাসজীবনের পথরেখা অনুসরণ করব। তৎপূর্বে জে. জি. ওসাওয়া প্রণীত *The Two Great Indians in Japan* নামক গ্রন্থে 'টোকিওতে তরুণ বোস' শীর্ষক অধ্যায় থেকে জাপানে সদ্য সমাগত রাসবিহারীকে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করব। শ্রীওসাওয়া লিখেছেন:

"বোস কোবেতে পৌঁছলেন এবং ১৯১৫ সনের জুন মাসে তিনি টোকিওতে গিয়েছিলেন। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তিনি এলেন সাংহাইতে। কিন্তু সেখানে তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়, কারণ চীনদেশে তখন বিপ্লব চলছিল। সেখানে বহু ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ অবস্থান করছিল। বোস আবার টোকিওতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং এইখানে তিনি চীনের বিখ্যাত বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী দলের নেতা সূন ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে পরিচিত হন। (১৯১৩ সনের নানকিন বিদ্রোহে পরাজয়ের পর ইনি তখন জাপানে এসে পলাতক জীবন যাপন করছিলেন।) দেখা যাচ্ছে একই সময়ে ভারতের বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু ও চীনের বিপ্লবী নেতা সূন ইয়াৎ-সেন জাপানে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন।

পলাতক এই দুই সমমর্মী ও সমপন্থী বিপ্লবীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। সূনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বোসের জীবনে শুভ হয়েছিল, কারণ তিনি বহুবার এই ভারতীয় বিপ্লবীর জীবনরক্ষা করেছিলেন।

"টোকিওতে পৌঁছবার পাঁচ মাস পরে ২৭শে নভেম্বর, ১৯১৬, বোস ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি বিরাট সভা সংগঠিত করেছিলেন। এই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন লালা লাজপৎ রায় ও হেরম্বলাল গুপ্ত। (ইঁহারা যুক্তরাষ্ট্রস্থ ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন।) আমার বন্ধু ডাঃ শেমাই ওকাওয়া এই সভার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ইউনো পার্কের নিকটস্থ সেইকেন রেস্তোরাঁতে এই সভা হয়েছিল। লাজপৎ রায়ের বক্তৃতায় জাপানী শ্রোতাদের সকলেই মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হন। সকলেই প্রবলভাবে ভারতে ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুরতার কথা বলেন। এই সংবাদে বিচলিত ও ভীত হয়ে টোকিওস্থ ব্রিটিশ দূতাবাস জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রীকে অবিলম্বে ভারতীয় বিপ্লবীদের বহিস্কৃত করে দেওয়ার জন্য চাপ দিলেন। সেই চাপের নিকট জাপ-সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী নতি স্বীকার করলেন। পশ্চিমের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির নিকট জাপ-বৈদেশিক দপ্তরের দাসত্ব ও জাপানী জাতির উপর ঐ শক্তিবর্গের নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা তখন একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। জাপানের অধিবাসীবৃন্দ তাই জাপ-সরকারের বৈদেশিক নীতির উপর বীতশ্রদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এই দপ্তরটি যেমন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিনের বশম্বদ হয়েছিল, তখন তেমনি ইহা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বশম্বদ ছিল।

"পরের দিন সকালেই লাজপৎ রায় আমেরিকায় পলায়ন করলেন। বোস আর গুপ্তকে পুলিশ হেডকোয়াটার্সে তলব করা হয় ও তাঁদের প্রত্যেকের উপর একখানি করে ডিপোর্টেসনের হুকুমপত্র দেওয়া হয়। ঐ আদেশে বলা হয়েছিল যে, পাঁচদিনের মধ্যেই তাঁদের উভয়কেই জাপান ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু সেই ভারতীয় বিপ্লবী দুইজন

নতি স্বীকার করবার মতো মানুষ ছিলেন না। তাঁরা পুলিশের সেই হুকুম অগ্রাহ্য করলেন। তাঁরা যেসব সংবাদপত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে আবেদন জানালেন এবং যেসব জাপানীদের তাঁরা জানতেন তাঁদের কাছেও আবেদন জানালেন। অবশেষে জাপানের বর্ষিয়ান নেতা তোয়ামার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ইনি একজন যথার্থ সামুরাই ছিলেন। ভাবতে হিন্দুদের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ' বলতে যে শ্রেণীকে বুঝায়, জাপানের সামুরাইগণ ঠিক সেই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। সামুরাইরা চিরকাল অহিংসার পক্ষপাতী। পরের দিন প্রভাতী সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, জাপানের প্রায় প্রত্যেকখানি কাগজে বৈদেশিক দপ্তরের বিরুদ্ধে কঠোর সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। বহু সুপরিচিত রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবহারজীবী এই দু'জন তরুণ ভারতীয়কে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হলো। তখন প্রাচ্যের অভিমুখে ফিরে যাওয়ার জন্য কোনো স্টীমার পাওয়া গেল না। ফিরে যেতে হলে য়ুবোপগামী জাহাজেই তাঁদের চড়তে হবে আর সেই জাহাজ যেই সাংহাই বন্দরে ভিড়বে অমনি তাঁরা ব্রিটিশ পুলিশ দ্বারা কবলিত হবেন।

"পুলিশের প্রধান কর্তা এই মর্মে হুকুমজাবি করলেন যে, ২রা ডিসেম্বর, ১৯১৫, ইয়োকোহামা বন্দর থেকে যে জাহাজটি ছাড়বে, বহিষ্করণ আদেশপ্রাপ্ত ভারতীয় দুইজন যেন ঐ জাহাজে চড়ে জাপান ত্যাগ করেন। যদি তাঁরা এই আদেশ অমান্য করেন তাহলে তাঁদের জোর করে ঐ জাহাজে চড়িয়ে দেওয়া হবে। ভাগ্যের কি পরিহাস, ভারতের এই বিপ্লবী দুইজন না পারেন ভারতে অবস্থান করতে, না পারেন জাপানে। যাই হোক, তাঁরা কিন্তু এই হুকুম মানলেন না। উৎ-কণ্ঠার মধ্য দিয়ে দিন কাটতে থাকে তাঁদের। ১লা ডিসেম্বর। বোস আর গুপ্ত সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে শান্তভাবে

বসে আছেন, আর পুলিশের বিষদাঁত ক্রমশই তাঁদের নিকটবর্তী হয়ে আসছিল। এমন অবস্থায় তাঁরা কি করতে পারেন? বন্ধুহীন এই তরুণ আগন্তুক দুইজন জাপানে উপস্থিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে জাপ-সরকারের কাছ থেকে ডিপোর্টেসনের আদেশ পেলেন এবং সেই আদেশে বলা হলো যে পুলিশ তাঁদের বলপূর্বক এই দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এমন অবস্থায় কোনো বিপদের ঝুঁকি নেওয়া চলে না। তাঁরা অবশ্য যে কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন। একতরফা বিচারে তাঁরা দণ্ডিত হয়েছিলেন—দণ্ডিত হয়েছিলেন দেশ-প্রেমের জন্য। উদ্ধার পাওয়ার কোনো পথ নেই; ঘাতকের খড়্গের জন্য তাঁদের অপেক্ষা করতেই হবে। এখন শুধু সময়ের প্রশ্ন। খড়্গ প্রায় নেমে আসার উপক্রম হয়েছে।

"দুপুরবেলায় সংবাদপত্রের দু'জন লোক এলো তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ঠিক এই সময়ে তাঁদের ছোট্ট কামরার প্রবেশ-পথে একখানি মোটর গাড়ি এসে থামল এবং সেই গাড়ি থেকে একজন জাপানী ভদ্রলোক লাফ দিয়ে পড়লেন। তিনি তাঁদের দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন এবং দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে মুহূর্ত মধ্যে তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কেউ জানত না তাঁদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো এবং পরবর্তী আট বছর কাল ধরে, এক তরুণী জাপানী বালিকা ও তাঁর মা ভিন্ন, তাঁদের সংবাদ কেউ জানতে পারে নি।"

পরবর্তী কাহিনী আমরা রাসবিহারীর শ্বশ্রুমাতার বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করছি। তার আগে ঘটনার সূত্র বুঝবার পক্ষে সুবিধা হবে বলে দু'একটি কথা এখানে বলা দরকার। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন রাজধানী টোকিওর পশ্চিম প্রবেশপথে সিনজিকু নামে একটি রেলস্টেশনের নিকটে 'নাকামুরায়া' নামে একটি বেকারি (পাঁউরুটি তৈরির দোকান) ছিল। এই বেকারির মালিক ছিলেন আইজো সোমা। তিনি সংবাদপত্রে ঐ দুইজন ভারতীয় বিপ্লবীর

বিপদের কথা জানতে পেরে খুব উদ্বিগ্ন হন। ১লা ডিসেম্বর সকাল-বেলায় তিনি তাঁর দোকানে সমাগত জনৈক ক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি সংবাদপত্রে বর্ণিত ঐ তুইজন হতভাগ্য ডিপোর্টিদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য অবগত আছেন কিনা। তখন সেই ক্রেতাটি তাঁকে অতি গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদ দিলেন। বললেন, তাঁদের রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে কোনো একটি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখার জন্য তোয়ামা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তখন সেই কথা শুনে সোমা চুপিসারে তাঁকে বললেন যে, তাঁর অব্যবহার্য পুরাতন কারখানার মধ্যে ভারতীয় তুইজনকে তিনি অনায়াসে লুকিয়ে রাখতে পারেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, সেখানে পুলিশের দৃষ্টি পড়বার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেই ক্রেতাটি ছিলেন একটি পত্রিকার সম্পাদক ; তাঁর নাম নাকামুরা। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর এক সাংবাদিক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ তোয়ামার সঙ্গে দেখা করেন। তিনিও তখন হতভাগ্য ভারতীয় তুইজনের বিপদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। সব শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ রাসবিহারী, হেরম্ব গুপ্ত ও বেকারীর মালিক সোমাকে তাঁর বাসভবনে ডেকে পাঠালেন। তোয়ামার বাড়ির চারদিকেও সর্বক্ষণ গোয়েন্দা পুলিশ তাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখত।

এইবার আমরা শ্রীমতী কোকো সোমার বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দেব। তিনি লিখেছেন ঃ "২৮শে নভেম্বর, ১৯১৫, আমি সর্বপ্রথম জানতে পারি যে পুলিশ জাপানে সমাগত হতভাগ্য ভারতীয় বিপ্লবীর উপর বহিষ্করণের আদেশ জারি করেছে। তাঁকে পাঁচদিনের মধ্যেই জাপান ত্যাগ করে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই বহিষ্করণের অর্থ ছিল তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে সঁপে দেওয়া এবং তার অর্থ মৃত্যু। তখনকার দিনে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সব সময়েই দোকানে থাকতাম ও পাঁউরুটি মুড়ে দিতাম, দাম নিতাম, আর কখনো কখনো খরিদ্দারদের অভ্যর্থনা করতাম। এই সংবাদে আমার

স্বামীকে খুব বিচলিত হতে দেখেছিলাম এবং এই ভারতীয়টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। সকালে তিনি 'নিরোকু' পত্রিকার সম্পাদক নাকামুরা (ইনি আমাদের দোকানের একজন নিয়মিত খরিদ্দার ছিলেন) দোকানে আসামাত্র তাঁকে সব কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমার স্বামীকে খুব আগ্রহভরে নাকামুরার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম। কিন্তু আমি তখন অন্যান্য খরিদ্দারদের নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম, আমি তাই ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। দেখলাম একটা কাজে তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদেই নাকামুরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে আমার স্বামীর খোঁজে এলেন এবং তখনই আমি সর্বপ্রথম জানতে পারলাম যে, সকালবেলায় তিনি নাকামুরার কাছে কি প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর খোঁজ দিতে পারল না। যে-সব টেলিফোন নম্বর আমাদের জানা ছিল আমরা তার প্রত্যেকটিতে রিং করলাম, কিন্তু কোথাও তাঁর উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

"অবশেষে আমাদের দোকানের ফোনটা বেজে উঠল। ফোন ধরেই আমার স্বামীর পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তাঁকে তক্ষুণি দোকানে ফিরে আসতে বললাম। সেইদিন রাত্রেই বোস ও তাঁর বন্ধুকে আমরা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিই। পরের দিন সকাল-বেলার কাগজে তাঁদের দুইজনের অন্তর্ধানের সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমাদের বাড়ি নিরাপদ হবে জেনেই তোয়ামা এই ব্যবস্থা করে-ছিলেন। আমার স্বামী যখন গভীর রাত্রে তোয়ামার বাড়ি থেকে এঁদের নিয়ে আসেন তখন এঁরা দু'জনেই সম্পূর্ণ জাপানী বেশে সজ্জিত ছিলেন। টোকিও শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট একটি বাগানসমেত তোয়ামার বাড়ি। সেই উদ্যানের পশ্চাৎ দরজা দিয়ে বোস ও তাঁর বন্ধুকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। তোয়ামার টুপি ও কিমোনো দিয়ে বোসের ছদ্মবেশটি তৈরী হয়েছিল। বাগানের পেছনেই একখানি

গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তাঁরা দু'জনে পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এসে ঐ গাড়িতে উঠলেন আর আমার স্বামী সামনের দরজা দিয়ে বহির্গত হয়ে, একটু ঘুরে গিয়ে সেই গাড়িতে তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। তোয়ামার বাড়ির ঠিক সামনেই তখন পুলিশের বড়কর্তার গাড়ি অপেক্ষা করছিল ও সেখানে ইউনিফর্ম-পরিহিত কয়েকজন পুলিশ ও গোয়েন্দাও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু জাপানের সর্বজনমান্য তোয়ামার বাড়িতে ঢুকে যে তল্লাসী করবে এমন সাহস পুলিশের ছিল না। তখন তাঁর বাড়ির সমস্ত জানালা বন্ধ ছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা সেই প্রাসাদের দেউড়িতে ঢুকে সেই ভারতীয় দুইজনের কথা জিজ্ঞাসা করে। একটি ভৃত্য উত্তরে তাদের জানায় যে কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তারা এইখান থেকে চলে গেছে। এই কথা শুনে পুলিশের আতঙ্কের সীমা-পরিসীমা থাকে না। প্রবেশপথে তারা সেই ভারতীয় পলাতক দুইজনের দুইজোড়া জুতা দেখতে পেয়েছিল।

"যে গাড়ি করে তোয়ামার বাড়ি থেকে বোস ও তাঁর বন্ধুকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখনকার দিনে সেইটি ছিল টোকিও শহরের সবচেয়ে শক্তিশালী গাড়ি—ঘণ্টায় আশী মাইল বেগে ছুটতে সক্ষম। সেই গাড়ির পিছু নিয়ে তাকে লঙ্ঘন করা অন্য কোনো গাড়ির পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই তোয়ামা নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যদিও তারা পিছু নেয় তাহলেও পুলিশের গাড়ি কিছুতেই সেই গাড়ির নাগাল পাবে না। এইটিই ছিল ডাক্তার সুগিয়ামার গাড়ি। পরের দিন সকালবেলায় আমার স্বামী তাঁর ভৃত্যদের—এরা দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর পরিচর্যা করে আসছিল—ডেকে বললেন, বন্ধুগণ, আমি একটা ভীষণ বিপদের ঝুঁকি, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নিতে চলেছি। বহিষ্করণ দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত দুইজন হতভাগ্য পলাতক ভারতীয় বিপ্লবীকে আমি আমার অব্যবহার্য পুরাতন কার-

খানাঘরে লুকিয়ে রেখেছি। এটা আমার পক্ষে খুবই দুঃসাহসের কাজ। যেহেতু এটা একটা আন্তর্জাতিক সৌজন্যের বিষয়, সেইজন্য আমি এই কাজ করতে সাহসী হয়েছি। আমরা জাপানীরা আমাদের চোখের সামনে তাদের মরতে দিতে পারি না।

"এই কথা শুনে ভৃত্যগণ খুবই আনন্দিত হলো, তারা কোনো আপত্তিই করল না। তাদের গৃহস্বামীর এই সিদ্ধান্ত তারা যে শুধু সানন্দে গ্রহণ করল তা নয়, তারা সকলেই তখন একবাক্যে আমার স্বামীকে এই বলে আশ্বাস দিল যে, তারা তাদের প্রাণ দিয়ে আশ্রয়-প্রার্থী ভারতীয় বিপ্লবী দু'জনকে রক্ষা করবে। তাদের চোখে-মুখে অকপট প্রভুভক্তি যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি আমার দুই-জন পরিচারিকার মধ্যে একটিকে বোসের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করে-ছিলাম।"

আজ যখন আমরা কল্পনা করি যে সুদূর জাপানে এক পাঁউরুটি বিক্রেতার অব্যবহার্য একটি পুরাতন কারখানা ঘরের মধ্যে রাসবিহারী বসু আত্মগোপন করেছিলেন, তখন সেই ঘটনা আমাদের স্মৃতিপটে ১৯১০ সনে সকলের অলক্ষ্যে কলিকাতা ত্যাগ করে চন্দননগরের মতিলাল রায়ের গৃহের কাঠের আসবাবপত্র ভরা একটি ঘরের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষের সেই দুঃসাহসিক আত্মগোপনের চিত্রটি ভেসে ওঠে আর সেই সঙ্গে ভেসে ওঠে চব্বিশ বছর আগে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে সুদূর কাবুলে দুর্গন্ধপূর্ণ উটের আস্তা-বলের মধ্যে ছদ্মবেশী সুভাষচন্দ্রের সেই আত্মগোপনের চিত্রটি। ভারতের এই তিনজন বিপ্লবী সন্তানকে স্বাধীনতার জন্য যে কতখানি মূল্য দিতে হয়েছিল তা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার জিনিস, বুদ্ধি দিয়ে নয়। বিপ্লবের কণ্টকময় পথে কিভাবে চলতে হয়, তা আমরা রাসবিহারীর জীবনের ইতিহাস থেকে যেভাবে শিক্ষা পাই, তার কোনো তুলনা হয় না।



পুত্র-কন্যা সহ রাসবিহারী

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু স্মারক সমিতির সৌজন্যে



রাসবিহারীর সহধর্মিনী ও শ্বশ্রুমাতা

দিল্লীতে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার কিছুকাল পরে লর্ড হার্ডিঞ্জ বিলাতে ভারতসচিবের কাছে একটি জরুরী ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিলেন। সেই ডেসপ্যাচের তারিখ, ২৫শে মার্চ, ১৯১৩, অর্থাৎ দিল্লীর ঘটনার তিনমাস পরে হার্ডিঞ্জ এইটি লিখে পাঠাচ্ছেন। উক্ত ডেসপ্যাচের শেষের কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত হলো: "Thus in view of the igneous situation in India consequent to the terrorist activities of some revolutionaries belonging to Bengal and the Punjab, it is suggested that special steps should be adopted to root it out, if only the safety of his Majesty's Indian empire is desired." দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে সেই সময়ে যে বৈপ্লবিক ঘটনাবলী একটির পর একটি ঘটে চলেছিল তা ইংরেজ সরকারকে রীতিমতো বিচলিত করে তুলেছিল। এর নেপথ্য নায়ক সেদিন যিনি ছিলেন সেই রাসবিহারী বসু সম্পর্কে ১৯১৫ সনের জুন মাসে হার্ডিঞ্জের অপর একটি ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল: "The most dangerous of them is Rashbehari Bose who has now escaped to Japan, His Majesty's Government should bring pressure on the Foreign Ministry of the Japanese Government for immediate extradition of this arch enemy of the Indian empire who planned an armed revolt among the rank and file of the Indian army"

এর থেকেই আমরা জানতে পারি যে, জাপ-সরকারের উপর সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার রীতিমতো চাপ দিয়েছিলেন। ভারত থেকে

পালিয়ে গিয়ে রাসবিহারী যে জাপানেই অবস্থান করছেন, এ সংবাদ তখন ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরে এসে গিয়েছে। ১৯১১ সন থেকেই এই মানুষটি ভারত সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বিপ্লবীজীবনের রেখাচিত্রটি তখন থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। লাহোরকে কেন্দ্র করে তাঁর সংযোগের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত অবধি। সেদিন উত্তর ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের ভাববন্যাকে ভগীরথের মতো তিনিই বইয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার উর্বর মাটিতে যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন, এক দশকের মধ্যেই তা মৃত্তিকার তলদেশ ভেদ করে অগ্নিগ্রাসী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ঐ সময়ে তিনি এই বিপ্লব সংগঠন ও পরিচালনার কার্যে তাঁর মস্তিষ্ক কি পরিমাণে আলোড়িত করেছিলেন তার পরিচয় আছে রাসবিহারী প্রণীত তখনকার একাধিক গুপ্ত ইস্তাহার ও পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে। ১৯১৫ সনে তিনি ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে যে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন, তার আনুপূর্বিক বিবরণ যখন সরকারের হস্তগত হয় তখন তিনি জাপানে। সেইজন্যই বোধ হয় ভারত সরকার তথা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বাহু জাপান পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য; সেইজন্যই বোধ হয় তাঁর মাথার উপর "জীবিত অথবা মৃত" অবস্থায় গ্রেপ্তারের পরওয়ানা ঘোষণা করা হয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাসের নেপথ্য বিধানে তিনি জাপানেও নিরাপদে ত্রিশ বৎসরকাল অতিবাহিত করে তাঁর জীবনব্রত উদ্‌যাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুত রাসবিহারী বসুর জীবনের এই ত্রিশ বছরকালের ইতিহাস নিয়েই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হতে পারে। সেদিনের সেই বিক্ষুব্ধ দিনগুলি আজ অতীতে বিলীন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের বুকে তার রেখাচিহ্ন আজো এমনই সুস্পষ্ট ও সুবলয়িত যে

আমরা 'রাসবিহারী বসু'—এই নামটি কিছুতেই আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে পারি না। তেমনি মুছে ফেলতে পারি না সেই মহান জাপানী স্বদেশপ্রেমিক তোয়ামাকে ও সেই অখ্যাত সোমা-পরিবারকে যাঁরা সেদিন সর্বপ্রযত্নে এই বিপ্লবী-নায়কের জীবন রক্ষা করেছিলেন।

সোমা-পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে রাসবিহারী বসু দীর্ঘকাল যাবৎ 'তোমাসা' এই নামে আত্মগোপন করে অবস্থান করেছিলেন। মা যেমন তাঁর সন্তানকে আপন স্নেহের আড়াল দিয়ে সর্বদা রক্ষা করেন, শ্রীমতী কোকো সোমা ঠিক তেমনিভাবে এই নির্বাসিত বিপ্লবীকে রক্ষা করেছিলেন। কথিত আছে, সেই গুপ্ত আবাসে থেকে চার মাসের মধ্যেই তিনি জাপানী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হেরম্ব গুপ্তও জাপান থেকে চলে গিয়েছিলেন। একা রাসবিহারী বসুই সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন। মিৎসুরো তোয়ামার মতো ব্যক্তি যে তাঁর মধ্যে এক অসাধারণ বিপ্লবীর সন্ধান পেয়েছিলেন তার কারণ তোয়ামা স্বয়ং একজন বিপ্লবী ছিলেন। এই শতকের প্রারম্ভে তিনিই ছিলেন জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির (Black Dragon Society) অবিসম্বাদী নেতা। জাপানের সামরিক নবজাগরণের স্রষ্টা এই কীর্তিমান পুরুষ এই ভারতীয় বিপ্লবীর প্রতি যদি আকৃষ্ট না হতেন, তাহলে তিনি তাঁর রক্ষার জন্য জাপ-পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন না। বিপ্লবীই বিপ্লবীকে চিনতে পারে—এই সত্যটি আমরা সেদিন এই তোয়ামা-রাসবিহারী বসুর সম্মিলনের মধ্যে নূতন করে উপলব্ধি করেছিলাম। তোয়ামার কাছ থেকে যেমন, তেমনি শ্রীমতী সোমার কাছ থেকেও তিনি যে অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ লাভ করেছিলেন তা প্রবাসে শত বিপদের মধ্যে তাঁকে রক্ষা করেছিল। শক্তিশালী তোয়ামা সেদিন তাঁকে আশ্রয়

দিয়েছিলেন বলেই না জাপ-পুলিশ রাসবিহারীর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি ; শ্রীমতী সোমা তাঁকে তাঁর বুকে তুলে নিয়েছিলেন বলেই না রাসবিহারীর পক্ষে তাঁর জীবনব্রত উদ্‌যাপন করার পথ সুগম হয়েছিল। এই জাপানী মহিলার মহত্ত্বের আর একটি কথা বলব। যে সময়ে রাসবিহারী বসুকে সোমা-পরিবার তাঁদের গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই সময়ে তিনি সর্বক্ষণের জন্য তাঁর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতেন, তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা ভাবতেন। এমন কি, রাসবিহারীর আগমনের দু'সপ্তাহ পরে যখন তাঁর একটি শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়, তখন তিনি এই নির্বাসিত বিপ্লবীর কথা চিন্তা করে সেই নিদারুণ পুত্রশোক বিস্মৃত হতে পেরেছিলেন—শ্রীমতী সোমা স্বয়ং এই কথা বলেছেন। এই মাতৃস্নেহের তুলনা নেই।

সাড়ে চার মাস পরে জাপ-সরকারের বৈদেশিক দপ্তর তাঁদের মতের পরিবর্তন করলেন ; পুলিশ রাসবিহারীর উপর থেকে বহিষ্করণের আদেশ প্রত্যাহার করে নিল। ১৯১৬ সনের এপ্রিল মাসে এই আদেশ তুলে নেওয়া হয়েছিল। জাপ-পুলিশের আদেশ প্রত্যাহৃত হলো বটে, কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি তাঁকে সন্ধান করে ফিরতে লাগল ; হিংস্র হায়েনার মতোই তারা তাকে খুঁজতে লাগল। জাপানী কিমোনোর অন্তরালে আত্মগোপন করে যদিও সেই সময় রাসবিহারী বাইরে চলাফেরা করতেন তথাপি তাঁর গতিবিধির উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ প্রখর দৃষ্টি রাখত। এই বিশেষ পুলিশ দলটি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে প্রেরিত হয়েছিল। রাসবিহারী শ্রীমতী সোমাকে 'মা' বলে ডাকতেন। যেদিন তিনি সোমা-পরিবারের আশ্রয় ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান, সেদিন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রাসবিহারী তাঁকে এই কথা কয়টি বলেছিলেন, "মা, আমি কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, তা জানি না। আমার প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে আপনি আপনার শিশু-পুত্রকে হারিয়েছেন। মা, আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের

ভাষা নেই।" তারপর দুজনে দুজনার হাত ধরে নীরবে কাঁদলেন। শ্রীমতী সোমা তখন পীড়িত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন, তাই তিনি নীচেয় নেমে এসে রাসবিহারীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করেছিল। যখন রাসবিহারীকে নিয়ে মোটর গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল তখন সজল নয়নে শ্রীমতী সোমার কণ্ঠ থেকে এই কথা কয়টি উচ্চারিত হয়েছিল: "I have lost my baby but I got close contact with the spirit of great Mother India." একটি জাপানী মায়ের অন্তরে এক নির্বাসিত ও নিগৃহীত ভারতীয় বিপ্লবীর জন্য এই যে বেদনাবোধ, এর মূল্য কতখানি তা শুধু অনুভবের বিষয়, বিচার-বিতর্কের বিষয় নয়।

যে সাড়ে চার মাসকাল রাসবিহারী সোমা-পরিবারে অবস্থান করছিলেন সেই সময়ে তিনি আপন স্বভাবসিদ্ধ মধুর আচার-আচরণের গুণে ঐ পরিবারের সকলেরই প্রিয় হয়েছিলেন। গৃহের ভৃত্য ও পরিচারিকারা পর্যন্ত তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। সোমা-দম্পতির জ্যেষ্ঠা দুহিতা কিশোরী তোসিকোর নিপুণ হস্তের সেবা ও সাহচর্য রাসবিহারীর নির্বাসিত জীবনের বেদনাকে এক অপরিমেয় শান্তিতে পূর্ণ করে দিয়েছিল। তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, একদিন লাজনম্রা এই কুমারীই তাঁর জীবনে জীবনসঙ্গিনী হয়ে আসবেন। নিজের চেষ্টায় এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি সুন্দররূপে জাপানী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। রাসবিহারী ছিলেন একজন নিপুণ ভাষাতত্ত্ববিদ্। জাপানী ভাষায় তাঁর রচনায় গভীর পাণ্ডিত্য ঐ দেশের বিদগ্ধ সমাজের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। শুধু লেখা বা পড়া নয়, ঐ ভাষায় তিনি অনর্গল কথাও বলতে পারতেন। ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর তুল্য জাপানী ভাষায় জ্ঞান ও দক্ষতা আজ পর্যন্ত আর কেউ দেখাতে পারেন নি। জাপান সত্যিই তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি ছিল।

বহিষ্করণের আদেশ প্রত্যাহৃত হলেও, নিরাপত্তার জন্য পরবর্তী নয় বৎসর কালের মধ্যে রাসবিহারীকে সতেরবার বাসস্থান বদল করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের উৎপাতে কোনো এক স্থানে দীর্ঘকাল তিনি থাকতে পারেন নি। আজ এখানে, কাল সেখানে, কোথাও বা মাত্র কয়েক রাত্রি, এইভাবে দীর্ঘ নয় বৎসরকাল চলেছিল তাঁর ভাসমান জীবন। অবশেষে ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে যখন তিনি জাপ-নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন তখন থেকে পরবর্তী উনিশ বৎসরকাল তাঁর জাপানে অবস্থান সহজ ও নিরাপদ হয়েছিল। ঐ নয় বৎসরকাল তিনি যে আত্মগোপন করে জাপানে থাকতে পেরেছিলেন তা শুধু সম্ভব হয়েছিল মহাপ্রাণ তোয়ামার জন্যই। জাপানেও ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। দুর্বল স্নায়ুর মানুষ হলে রাসবিহারী ঐ নয় বৎসরের দুর্ভোগের মধ্যে ভেঙে পড়তেন। কিন্তু তোয়ামার সদা সতর্ক দৃষ্টি এই বিপ্লবীকে ঘিরে থাকত বলে ব্রিটিশ দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ বা ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করতে সক্ষম হয় নি।

১৯১৬, এপ্রিল মাসে বহিষ্করণের আদেশ প্রত্যাহৃত হওয়ার দুই বৎসর পরে তোয়ামা উপলব্ধি করলেন যে, সব সময়ে রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ রক্ষা করা কঠিন, অথচ তাঁকে বাঁচাতে হলে সংযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। তাঁর অনুচরবৃন্দের মাধ্যমে এই কাজ হওয়া সম্ভব ছিল না। এ কাজের জন্য একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার। শুধু বিশ্বাসী হলে চলবে না, তাকে বুদ্ধিমানও হতে হবে। কে এই কঠিন কাজের ভার নিতে পারে? এই চিন্তায় তোয়ামা খুবই অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এলেন কুমারী তোসিকো।

বোস যে কোনো সময়ে গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হতে পারেন, মাঝে মাঝে এই আশঙ্কাও জাগত তোয়ামার মনে। দিনের পর দিন

ব্রিটিশ দূতাবাসের কর্মতৎপরতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাতে তাঁর মনে হলো যে, এমন একজন কাউকে দরকার যে সর্বক্ষণের জন্য বোসের পাশে দেহরক্ষীর মতো থাকতে পারবে। তোয়ামা কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারলেন না। তখন একদিন তিনি আইজো সোমার কাছে এলেন এবং বোসের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা তোসিকোর বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব তুললেন। তোসিকোর বয়স তখন কুড়ি বছর। এ ছাড়া, এই হতভাগ্য ভারতীয়কে বাঁচাবার আর তো কোনো পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না, এই কথা এমন আন্তরিকতার সঙ্গে তোয়ামা তাঁকে বলেছিলেন যে তা শুনে আইজো সোমা একটু বিচলিতও হয়েছিলেন।

তিনি জানতেন যে বোস তাঁদের পরিবারের সকলেরই প্রিয়; বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী তো এই ভারতীয় যুবককে আপন পুত্রের মতোই জ্ঞান করেন। তিনি যখন তাঁর স্ত্রীর কাছে তোয়ামার এই প্রস্তাব বর্ণনা করলেন তখন তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, আমার কোনো অমত নেই, তবে এ ক্ষেত্রে মেয়ের মত ভিন্ন কিছু হতে পারে না। শ্রীমতী সোমা তখন তাঁর কন্যাকে কাছে ডেকে সব কথা বোঝালেন এবং সবশেষে বললেন, তুমি যদি এই ভারতীয়কে বিয়ে করো তবেই তার প্রাণ রক্ষা হয়। তোয়ামার আদেশ, মায়ের অনুনয়, মেয়ের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন ছিল। তবু কুমারী তোসিকো এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে এক মাসের সময় চাইলেন।

জাপানের সামাজিক প্রথায় যে কোনো রকম আন্তর্জাতিক বিবাহ নিন্দিত ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন জাপানীরা ছিল অত্যন্ত জাতীয়তাবাদী ও গোঁড়াপ্রকৃতির। যেসব মেয়ে য়ুরোপের কোনো মানুষকে বিয়ে করতো—তারা যত বড়ো পদস্থ বা ধনী হোক না কেন—সেই সব মেয়ের সমাজে স্থান হওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু একজন ভারতীয়, চীনা বা ইন্দোনেশিয়ার লোককে বিয়ে করলে

সামাজিক নির্যাতনের সীমা-পরিসীমা থাকত না। টোকিওর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত এক ব্যবসায়ীর জ্যেষ্ঠা কন্যা একজন নির্বাসিত ও ভারতীয়কে—যার মাথার উপর মৃত্যুর ছায়া প্রসারিত রয়েছে—বিয়ে করবেন, এটা শুধু অভাবনীয় নয়, অসম্ভব ব্যাপারও ছিল। শ্রীমতী সোমা বা তাঁর স্বামী রাসবিহারীকে যতই পুত্রবৎ স্নেহ করুন না কেন, তাঁদের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা তাঁদের মনে কোনোদিনই জাগে নি। এই বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য তাঁরা তোয়ামার কাছে এক মাসের সময় চেয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে এক মাস উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সেদিন কন্যাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন শ্রীমতী কোকো সোমা এবং এই বিষয়ে তোসিকো কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা তিনি জানতে চাইলেন। কুমারী তোসিকো অবিচল কণ্ঠে উত্তর দিলেন—মা, আমি মিষ্টার বোসকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। পরবর্তী কাহিনী তোসিকো-জননী স্বয়ং এইভাবে বিবৃত করেছেন ঃ "আমার মেয়ের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। তোসিকো আমার প্রথম সন্তান, আদরের মেয়ে। তাই তার মুখে যখন এই উত্তর শুনলাম তখন আমি সুখী বোধ করলাম, কি অসুখী বোধ করলাম জানি না। আমি সজল চক্ষে জিজ্ঞাসা করলাম, বোসকে তুমি বিয়ে করতে চাও, কিন্তু এই বিয়ে তো আনন্দের হবে না। এখনো তুমি ভাল করে ভেবে ছাখো। সমাজে তোমার স্থান হবে না। আমি বার বার তাকে সব বোঝালাম, কিন্তু তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। তখন আমরা বোসকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তোসিকোকে বিয়ে করবে কি না এবং এর আগে তার বিয়ে হয়েছে কিনা, কারণ আমি জানতাম যে ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বোস বললে, না, সে বিয়ে করেনি। পনর বছর বয়স থেকেই সে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। তাই ছেলেবেলা থেকে সে বিয়ের কথা চিন্তা করার

অবকাশ পায়নি। তবে এ যদি মিস্টার তোয়ামার অভিপ্রেত হয় আর পাত্রী যদি কুমারী তোসিকো হন তাহলে তিনি রাজী।"

তারপর ১৯১৮ সনের এক শুভদিনে জাপ-দুহিতা তোসিকো নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। রাসবিহারীর প্রাণরক্ষার জন্য তোসিকোর এই আত্মত্যাগ বড়ো সাধারণ আত্মত্যাগ ছিল না। বিদেশীকে বিয়ে করা মানেই সামাজিক জীবনে অপাঙক্তেয় হওয়া। সে ধনীর মেয়ে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, কাজেই টোকিও শহরে যে কোনো সঙ্গতিসম্পন্ন বিদ্বান যুবকের সঙ্গে অনায়াসেই তার বিয়ে হতে পারত। তোসিকো-রাসবিহারীর পরিণয়ে পৌরোহিত্য করেছিলেন তোয়ামা স্বয়ং। সমস্ত ব্যাপারটাই গোপনে সমাধা হয়েছিল। বিয়ের পর প্রথম পাঁচ বছর তাঁদের বিবাহিত জীবন নানা উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল, কারণ তখনো পর্যন্ত তাঁরা কোনো একস্থানে নীড় বেঁধে থাকতে পারেন নি। বিয়ের পর তোসিকো একাগ্রচিত্তে তাঁর স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে মনোযোগী হলেন। শুভ্র লিলিফুলের মতো পবিত্র তাঁর জীবন তিনি এক নির্বাসিত বিপ্লবীর চরণে নিবেদন করে নিজেকে যেন ধন্য মনে করলেন। তাঁর স্বামীর ভেতর দিয়ে তিনি যেন স্বামীর জন্মভূমি ভারতবর্ষকেই ভালোবেসেছিলেন। কথিত আছে, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর রাসবিহারী একবার ভারতে তাঁর এক বন্ধুর কাছে এক পত্রে এই জাপ-দুহিতার মহত্ত্বের কথা বর্ণনা করে লিখেছিলেন—"What a noble soul she was."—এ মহত্ত্ব কোথায়? এই মহত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়েছিল রাসবিহারী বসুর মতো একজন নির্বাসিত ও পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করার মধ্যে। রাসবিহারী-তোসিকোর পরিণয়—এক জাপানী সামুরাই (ক্ষত্রিয়) বংশোদ্ভবা নারীর সঙ্গে এক ভারতীয় কায়স্থ-সন্তানের পরিণয়—এ যেন আমাদের ভারতীয় পুরাণেরই একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়। ক্ষুদ্র কিন্তু অশেষ গৌরবে মহিমান্বিত।

বিয়ের এক বছর পরে ১৯১৯ সনে তোসিকোর গর্ভে রাসবিহারীর প্রথম পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। ১৯২২ সনে ভারতে নির্বাসিত সমস্ত ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য প্রবল আন্দোলন হয়েছিল। এই নির্বাসিত ব্যক্তিদের তালিকায় রাসবিহারী বসুর মতো এমন কয়েক-জন ছিলেন যাঁদের মৃত্যু অথবা যাবজ্জীবন দণ্ডের মূল্য ভিন্ন ভারতে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায়ই ছিল না। টোকিওতে ব্রিটিশ দূতা-বাস তখনো পর্যন্ত রাসবিহারীর সন্ধানে আগের মতোই সমান মনো-যোগী ছিল। তখন তোয়ামা গোপনে তাঁর জন্য জাপ-নাগরিকত্ব লাভের আয়োজন করলেন। ১৯২৩ সনের মাঝামাঝি রাসবিহারী জাপানের নাগরিক বলে গণ্য হলেন। সূর্যোদয়ের দেশে এতদিন বাদে অজ্ঞাতবাসের অন্ধকার ভেদ করে সূর্যের সত্যিই উদয় হলো। এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র সামুরাই বংশোদ্ভব মহাপ্রাণ তোয়ামার জন্যই।

জাপ-নাগরিকত্ব লাভের পর শ্রীশচন্দ্র ঘোষকে তিনি যে পত্র-খানি লিখেছিলেন সেটি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। ঐ চিঠিতে রাসবিহারী লিখেছেন ঃ "তুমি জেনে আনন্দিত হবে যে আমি এখন জাপানের নাগরিকত্ব অর্জন করেছি। এর ফলে আমি ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল-গুলি ব্যতিরেকে পৃথিবীর সর্বত্রই পরিভ্রমণ করতে পারব। যতদিন না এই নাগরিকত্ব লাভ করেছিলাম ততদিন আমি যেন একটি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম। এমন কি জাপানেও আমি স্বচ্ছন্দ্যে চলা-ফেরা করতে পারতাম না—কোরিয়া, চীন ও রাশিয়া যাওয়া তো দূরের কথা। ইংরেজরা এতকাল আমার উপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। কিন্তু এখন আমি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তাদের আইনের নাগালের বাইরে এবং আইনত তারা এখন আমার বিরুদ্ধে আর

কিছুই করতে পারবে না।" পরবর্তীকালে যে বিরাট ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এই নাগরিকত্ব অর্জন যে বহুলাংশে তার পথ সুগম করে দিয়েছিল, তা বলা বাহুল্য।

নাগরিকত্ব লাভ করার পর শুরু হয় তোসিকো ও রাসবিহারীর স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন। বিয়ের পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল তাঁরা কাটিয়াছেন অন্ধকারে, লোকচক্ষুর আড়ালে আর লোকালয় থেকে দূরে। এই পাঁচ বৎসরকালের মধ্যে তোসিকো একটি পুত্র ও একটি কন্যার জননী হয়েছিলেন। ছেলে-মেয়ে দুটিও এতকাল নির্জনতার মধ্যে বর্ধিত হয়েছে, এইবার তারা উন্মুক্ত আলোবাতাসের মধ্যে আর তাদের সমবয়সী সঙ্গী ও সঙ্গীনীদের সঙ্গে বাস করবার সুযোগ পেল। কিন্তু হায়, সুযোগ পেলে কি হবে? সমাজবিধানের উদ্যত খড়্গ তাঁদের ও তাদের মায়ের জীবনকে অভিশপ্ত করে রাখলো। একজন ভারতীয়কে স্বামীরূপে বরণ করে সমাজের চক্ষে তোসিকো যে অপরাধ করেছিলেন, তার কোনো ক্ষমা ছিল না। তাই তোসিকোর ভাগ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সামাজিক জীবনে ফিরে আসা আর সম্ভব হয় নি। বিপ্লবীর জীবন-উদ্যানের সেই চারু চেরীফুলটি তাই অকালেই ঝরে পড়ল। ১৯২৫ সনের মার্চ মাসে মাত্র আটাশ বছর বয়সে তোসিকোর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর এই অকালমৃত্যু রাসবিহারীর জীবনে নিঃসন্দেহে একটি শোচনীয় অধ্যায়। তাঁর শাশুড়ি তাঁর পুত্র-কন্যার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা একটু বয়োপ্রাপ্ত হলে তিনি জামাতাকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন নি। এই পত্নী-বিয়োগের শোক তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ভুলতে পারেন নি। তোসিকোর স্মৃতি বুকে নিয়েই তিনি তাঁর জীবনের অবশিষ্ট বিশ বৎসরকাল অতিবাহিত করেছিলেন। এই বিশ বৎসরকালই তিনি প্রবাসে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর

স্ত্রীর মৃত্যুর পর টোকিওর একটি সাময়িক পত্রিকায় 'আমার স্ত্রী তোসিকোর স্মৃতি'—শীর্ষক যে প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন তার মধ্যে তিনি এই মহীয়সী জাপ-দুহিতার চরিত্রের অনেক গুণ বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে তোসিকোর অভাব পূর্ণ করেছিলেন তোসিকো-জননী কোকো সোমা। তাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন বলেই না রাসবিহারী তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কালের মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ ও আই. এন. এ.—এই দুইটি ইতিহাস-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। শাশুড়ির অসীম স্নেহই রাসবিহারীকে তাঁর পত্নী-বিয়োগ-বেদনা সহ্য করার শক্তি দিয়েছিল।

বারো

ভারত থেকে পালিয়ে গিয়ে রাসবিহারী যখন জাপানে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন, সেই একই সময়ে (১৯১৫) তৎকালীন অন্যতম বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ইনিই পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায় এই নামে পরিচিত হয়েছিলেন।) পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাটাভিয়া গিয়েছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন 'ফাদার মার্টিন'—এই ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে। সেখানে একখানা জার্মান জাহাজ বোঝাই হয়ে বাংলার বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য কিছু রাইফেল, পিস্তল, গুলি ও টাকা আসবার কথা ছিল। মার্টিন ওরফে নরেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সেই 'মোভারিক' জাহাজ থেকে ঐগুলি নিয়ে আসতে। তাঁর এই মিশন কেন ব্যর্থ হয়েছিল, এ সম্বন্ধে তাঁরই সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং সেসব বিবরণ রায়ের অনুকূলে নয়। এখানে সেসব অপ্রীতিকর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। বাটাভিয়া পরিত্যাগ করে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। ফিলিপাইনের ভিতর দিয়ে নানা পথ ধরে প্রথমে তিনি জাপানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। নূতন একটি ছদ্মনামে তিনি নাগাসাকি বন্দরে অবতরণ করেন। নরেন্দ্রনাথ জানতেন রাসবিহারী বসু তখন জাপানে অবস্থান করছেন। এবং তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন মনস্থ করলেন। কিন্তু সেই সময়ে টোকিওতে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সহজ ছিল না। খুব সন্তর্পণে এ কাজ করতে না পারলে যুদ্ধে ব্রিটিশের সহযোগী জাপ-সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল।

এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের জীবনীকার শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস লিখেছেন : "টোকিওতে অপর একজনের ঠিকানা জানা ছিল। তারই

মাধ্যমে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। অনেক সতর্ক ও গোপন প্রয়াসের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। রাসবিহারীর সঙ্গে রায়ের পূর্ব পরিচয় ছিল না, কিন্তু প্রথম দর্শনেই নরেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রভাবিত করলেন এবং তাঁর আস্থাভাজন হলেন। সংগঠন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি (রাসবিহারী) হতাশ হয়ে তখন জাপানে স্থির হয়ে বসেছেন। রায়ের মত আশাবাদ তখন আর তাঁর ছিল না। রাসবিহারী যখন তাঁকে কোনরূপ সাহায্যের ভরসাই দিতে পারলেন না, তখন নরেন্দ্রনাথ চীনের নেতা সান ইয়াট্ সেন-এর সঙ্গে দেখা করলেন। এত সতর্কতা সত্ত্বেও রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎটা জাপানী পুলিশের কাছে গোপন থাকে নি। রাসবিহারী গোপনে সংবাদ দিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ যেন অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করেন, নতুবা এরা তাঁকে সাংহাই-এ ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবে।"

এই উক্তিটির মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিতর্কমূলক। প্রথমত, রাসবিহারীকে "প্রভাবিত" করে রায় তাঁর "আস্থাভাজন" হলেন— এর দ্বারা লেখক ঠিক কি বলতে চেয়েছেন তা বোঝা গেল না। দ্বিতীয়ত, "তিনি হতাশ হয়ে তখন জাপানে স্থির হয়ে বসেছেন"—এটি অত্যন্ত আপত্তিকর কথা। রাসবিহারী-চরিত্র যাঁরা গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন তাঁরা জানেন যে, সেই চরিত্রে 'পেসিমিজ্ম' বা হতাশার ভাব আদৌ ছিল না, বরং রায় অপেক্ষা তিনিই ছিলেন সবচেয়ে আশাবাদী। সংগঠন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সত্য এবং ভারতবর্ষে তৎকালীন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাসটা যাঁদের ভালোমতন জানা আছে তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, ১৯১৫ সনে (রাসবিহারীর ভারত ত্যাগের প্রক্কালে) এইটাই ছিল সংগঠনের অনিবার্য পরিণতি। আর "স্থির হয়ে বসে" থাকার মানুষ কি রাসবিহারী ছিলেন? রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় জাপানে রাসবিহারী কি অবস্থায় ছিলেন তা আমরা পূর্ব তুইটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তখনকার পরিবেশে

তাঁর পক্ষে রায়কে কোনো সাহায্য করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর কিসের জন্য সাহায্য ? নরেন্দ্রনাথের তখন তো কোনো কর্মসূচীই ছিল না, কোনো স্থির লক্ষ্য ছিল না যা রাসবিহারীর ছিল।

এখন দেখা যাক রায় স্বয়ং এই বিষয়ে কি বলেছেন। তাঁর স্মৃতি-কথায় মানবেন্দ্রনাথ লিখছেন : "Thereafter, in disgust, but still full of hope, I went to Japan. Rash Behary Bose was there with an identical mission ; he would certainly help me. But I was rather surprised to find that he now believed that our mission of liberating India would be accomplished only in consequence of the bigger mission of Japan to free Asia from White domination. I was still a full-blooded nationalist, and as such believed in the doctrine of racial solidarity. Nevertheless, I could not forget the fact that Japan was Britain's ally. How could we rely upon her helping us in our struggle against British domination ? Rash Behary smiled benevolently upon my ignorance of diplomacy : Japan had joined the war on the side of the Entente Powers with a purpose ; she should not be embarassed even if Indian revolutionaries were persecuted in Japan. We must have faith in the leader of Asia and wait patiently for our chance. It all sounded very impressive, but did not carry conviction."

রায়ের এই মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর দ্বারা তিনি রাসবিহারীর বৈপ্লবিক আদর্শ সম্পর্কে ও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন।

টোকিওতে সমাগত 'আশাবাদী' রায়ের সঙ্গে রাসবিহারীর যে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল তিনি স্বয়ং সেই বিষয়ে কোনো বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান নি। কিন্তু, "শ্বেতাঙ্গজাতির প্রভুত্ব থেকে সমগ্র এশিয়াকে মুক্ত করার বৃহত্তর উদ্দেশ্য যখন জাপানের সফল হবে, তখনই মাত্র তার ফলেই আমাদের ভারত উদ্ধার ব্রত সফল হবে," রাসবিহারীর মুখে এই কথা শুনে রায় বিস্ময়বোধ করেছিলেন, লিখেছেন। রাসবিহারীর সমগ্র জীবনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে ও অনুধাবন করে আমরা এমন কিছু পাই না যার দ্বারা রায়ের এই শিশু-সুলভ উক্তি সমর্থিত হয়। তিনিও যেমন সেই সময়ে মনে-প্রাণে জাতীয়তাবাদী ছিলেন, রাসবিহারীও তাই ছিলেন এবং রায়ের মতো তিনিও জাতীয় সংহতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বরং পরবর্তীকলে বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় রঙের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। রাসবিহারী বসু রাসবিহারী বসুই ছিলেন। বিপ্লবের স্বধর্ম থেকে, জাতীয়তাবাদের চির-পোষিত আদর্শ থেকে তিনি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি। এইটাই তো এই মহান বিপ্লবী নায়কের চরিত্রের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি জাপ-নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু আজীবনের পোষিত জাতীয়তাবাদ কি বিসর্জন দিয়েছিলেন? জাপানকে তিনি এশিয়ার নেতারূপে কোনোদিনই কল্পনা করেন নি। জাপানের সহায়তায় বিদেশ থেকে তিনি ভারতের মুক্তিসংগ্রামে যে প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং যে সহযোগিতা পেয়েছিলেন সে-সব ইতিহাস যাঁরা অবগত আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, সান ইয়াৎ-সেনের মতো রাসবিহারী জাপানকে এশিয়ার মুক্তিপ্রদাতা হিসাবে দেখেন নি। তবে প্রথম যুদ্ধের সময় যে জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে ছিল (এবং মিত্রশক্তির পক্ষে থাকাই অর্থ হলো ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সমর্থক) সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সেই জাপানকে সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলা—

এইটাই ছিল জাপানে রাসবিহারীর প্রথম ও প্রধান 'মিশন' এবং এই দুঃসাধ্য প্রয়াসে তিনি যে বিস্ময়কর সফলতা লাভ করেছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের জাপানের সরকারী রাজনীতিতে তিনি যে একটা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, এর সাক্ষ্য একাধিক জাপানী লেখক দিয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথ এইখানেই তাঁকে ভুল বুঝেছেন ও আমাদের ভুল বুঝিয়েছেন। রায়ের স্মৃতিকথার মধ্যে রাসবিহারী সম্পর্কে আরো একটি মারাত্মক উক্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হলো এই: "Nor was a share of the patronage enjoyed by Rash Behary offered to me." এর দ্বারা তিনি কি বলতে চান? জাপানে গিয়ে তিনি যে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, রাসবিহারী মানবেন্দ্রনাথকে তার অংশ দিতে সম্মত হন নি—এই উক্তি রায়ের মতো লোকের কাছ থেকে আমরা কখনো আশা করিনি। এর দ্বারা কি রায় এই বলতে চেয়েছেন যে, তিনি যে জাপানে গিয়ে আশ্রয়লাভ করতে সক্ষম হন নি, সেজন্য রাসবিহারী দায়ী ছিলেন? কিন্তু আমরা দেখেছি জাপানে উপস্থিত হয়ে জাপ-নাগরিকত্ব অর্জন না করা পর্যন্ত রাসবিহারী কিভাবে ঐ কয়বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গ আর অধিক আলোচনা করে লাভ নেই। এইবার আমরা আমাদের মূল কাহিনীতে ফিরে যাই।

১৯২৫ সনে পত্নী তোসিকোর মৃত্যুর পর রাসবিহারী কি করলেন? এই প্রসঙ্গে তাতুসিজিয়ো মাসিদা নামে জনৈক বিশিষ্ট জাপানী ব্যবসায়ী (ইনি জাপানে রাসবিহারীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন) লিখেছেন: "After the death of Mrs. Bose, Mr. Rashbehari Bose devoted himself to the management of Nakamuraya Candy Store and also lectures in universities and other

places. He was the best friend and leader of the Indian students in Japan and of Japanese young generation. Naturally he was very busy, but never forgot his cherished hope of Indian independence." 'নাকামুরায়া' ছিল সোমা পরিবারের পারিবারিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং টোকিও শহরের তৎকালীন অন্যতম সর্ববৃহৎ Provision Store-জাতীয় একটি দোকান। রাসবিহারী তাঁর শ্বশুরের এই কারবারটি দেখাশুনা করতেন ও অবসর সময়ে জাপানের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেকচার দিতেন। এজন্য প্রায়ই তাঁকে এক-স্থান থেকে অন্যত্র পরিভ্রমণ করতে হতো। এ ছাড়া, শিক্ষালাভের জন্য যে-সব ভারতীয় ছাত্র জাপানে যেতেন, তিনি তাদের তত্ত্বাবধানও করতেন; তিনি ছিলেন তাদের নেতৃস্থানীয়, যেমন নেতৃস্থানীয় তিনি হয়ে উঠেছিলেন জাপানের যুবসম্প্রদায়েরও। তাঁর ছেলেমেয়ে দুটিকে (রাসবিহারীর পুত্রের নাম মাসাহিদে আর মেয়ের নাম কুমারী তেতেকু।) মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাদের মাতামহ ও মাতামহী। নাগরিকত্ব অর্জনের পর রাসবিহারী টোকিও শহরে একটি স্বতন্ত্র গৃহে বাস করতেন। কিন্তু পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য তিনি সকল ব্যবস্থাই করেছিলেন। শহর থেকে কিছু দূরে অনডেন (Onden) নামক অঞ্চলে একটি অনতিপরিসর গৃহে তিনি তোসিকোকে নিয়ে তাঁর সংসার পেতেছিলেন। প্রতি শনিবার ছেলে-মেয়ে দুটি এখানে এসে তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে একত্রে আহার করত এবং রাত্রিবাস করে পরের দিন আবার তাদের দিদিমার কাছে ফিরে যেত। শনিবারের সন্ধ্যাটি বিশেষভাবেই তিনি পুত্র-কন্যার সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন।

এইসময়ে তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা যে খুব সচ্ছল ছিল তা নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে লেকচার দিয়ে অর্থাগম যা হতো তা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। তথাপি জানা যায় যে তিনি তাঁর এক বিধবা ভগ্নীকে নিয়মিত অর্থ-সাহায্য প্রদান করতেন। ১৯৩৪ সনে চন্দননগরে এই ভগ্নীর কাছে তিনি যে পত্রখানি লিখেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে :উদ্ধৃতিযোগ্য। এই চিঠির তারিখ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৪। তিনি লিখেছেন ঃ "স্নেহের সুশীলা, তোমার পত্র পাইলাম। টাকা পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার অবস্থা এখন তত ভাল নয় বলিয়া বেশি টাকা পাঠাইতে পারিলাম না। যখন পারিব পাঠাইব। এক সপ্তাহে আর কিছু টাকা পাঠাইবার চেষ্টা করিব। মাসীমার শরীর খারাপ জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। তিনি কেমন আছেন লিখিও এবং তাঁহাকে আমার প্রণাম দিও। তাঁহার সেবা খুব ভাল করিয়া করিও। চরকা ছাড়িও না। ইতি শ্রীরাসবিহারী বসু।" এই ক্ষুদ্র পত্রখানির ভিতর দিয়ে রাসবিহারীর চরিত্রের যে দিকটি দেখতে পাই সেখানে তিনি একজন খাঁটি বাঙালী। যে মাসীমা তাঁকে তাঁর শৈশবে মায়ের স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন, পরিণত বয়সে সুদূর জাপানে অবস্থান করেও জননীসমা সেই মাসীমাকে তিনি যে বিস্মৃত হতে পারেন নি এ·ং তাঁর অসুস্থতার সংবাদে চিন্তিত বোধ করেছেন, এর দ্বারা সেই বিপ্লবীর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের যে পরিচয় আমরা পাই, তার তুলনা নেই। এই সুশীলা সম্ভবত তাঁর মাসতুতো ভগ্নী হবেন, কারণ তাঁর নিজের কোনো সহোদরা ছিল বলে জানা যায় না। বিধবা বোনের প্রতি এই যে কর্তব্যবোধ, এ কি কম মহত্ত্বের পরিচায়ক? পত্রের শেষ লাইনটি—"চরকা ছাড়িও না"—বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তাঁর ভারত ত্যাগের পর থেকে এই পত্রখানি লেখার সময় পর্যন্ত

যে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয় হয়েছে এবং তাঁর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। অসহযোগ আন্দোলন ও তৎপরে আইন অমান্য আন্দোলনের উত্তাল বন্যায় সারা ভারতবর্ষ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে এবং এই দুইটি ইতিহাস-বিখ্যাত আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে গান্ধী-নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের শক্তির পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে দেশে চরকা-খদ্দরের প্রচলন হয়েছে। বাংলার ঘরে ঘরে পুরনারীরা চরকা কেটে সূতা তৈরি করে স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে চলেছেন। জাপানে বসে রাসবিহারী এইসব খবর যে রাখতেন তা তাঁর ভগ্নীকে লেখা পত্রের শেষ লাইনটিতে উক্ত "চরকা ছাড়িও না" কথাটির মধ্যে আভাসিত হয়েছে। ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলন আর ১৯৩১ সনের আইন অমান্য আন্দোলন, এই দুটি আন্দোলনের ধারা রাসবিহারী গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, ঐ সময়ে গান্ধীর সম্পাদিত বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক *Young India* পত্রিকাখানি টোকিওতে বসে তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন। বিশেষভাবে পাঠ করতেন ঐ পত্রিকার 'Weekly War News' শীর্ষক ফীচারটি। গান্ধী-পরিচালিত আন্দোলন যে বিপ্লবের সমতুল্য ছিল, এটা বুঝতে রাসবিহারীর বিলম্ব হয় নি।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে ১৯২২ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিও থেকে রাসবিহারী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে গান্ধীকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। এই পত্রখানিকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার একটি মূল্যবান নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। পত্রখানি তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে—"I am an Indian—a refugee in

Japan." তারপর অতীতকালে তাঁর নিজস্ব পন্থায় তিনি কিভাবে ভারতমাতার সেবা করেছেন এবং সেই পন্থা অনুসরণ করেই তিনি তাঁর ভবিষ্যতের কাজ চালিয়ে যাবেন, এইসব কথা বলার পর রাসবিহারী গান্ধীকে লিখেছেন: "আমার পন্থার সঙ্গে আপনার পন্থার কোনো সাদৃশ্য নেই, তথাপি আমি যে আপনাকে এই পত্রখানি লিখবার তাগিদ বোধ করছি তার কারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে আমি আপনার সুস্পষ্ট অভিমত জানতে চাই।"

এই পত্রখানি লিখবার যে তাগিদ তিনি বোধ করেছিলেন তার পটভূমিকাটি এখানে বলে রাখা দরকার। ১৯২২ সনের ৩রা আগস্ট তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় 'The Mentality of Free Nations' এই শিরোনামা দিয়ে ঐ সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদলের একটি মুখপত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তখন একটি দৌত্যকার্যে ঐ দেশে গিয়েছিলেন এবং শ্রমিকদলের মুখপত্রে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রী-দৌত্য সম্পর্কে একটি কঠিন সমালোচনা ছিল। এই সমালোচনার উত্তরে গান্ধী তাঁর কাগজে লিখেছিলেন "It is no wonder that the attitude of Australian workers is one of disgust towards an Indian who accepts the subjection of his country to foreign rules, when it is sought to be kept up not by consent but by force of military power." গান্ধীর নিকট লিখিত রাসবিহারীর এই পত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি তোলা হয়েছিল তাঁর নিজের ভাষায় সেটি এই: "Now I would respectfully ask you to let the Indian people know through the columns of your paper if there is a single instance in the whole world of a foreign rule kept up by the consent of the governed. No people on earth can consent to be governed by

another people. ....There can be either Freedom or the opposite of it—Slavery. There is no midway." এর পরেই রাসবিহারী লিখছেন: "যদি আপনি এবং অন্যান্য মান্যবর নেতাগণ ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা কামনা করেন, তাহলে ব্রিটিশের সঙ্গে সকল রকম সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এই মর্মে অবশ্যই এই ঘোষণা করতে হবে। অপরপক্ষে, পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চাপ না দেওয়াই যদি কংগ্রেসের অভিপ্রেত হয়, সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে বাস করে ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি সাধন যদি কংগ্রেসের লক্ষ্য হয়, হোমরুল নিয়ে কংগ্রেস যদি সন্তুষ্ট থাকতে চায়, কংগ্রেস নেতাদের উচিত সে কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা।" বিজিত জাতির অনুমতি নিয়ে বিদেশী শাসন বজায় রাখার কোনো দৃষ্টান্ত যে পৃথিবীর ইতিহাসে নেই, গান্ধীর সামনে সেই সত্যটাই রাসবিহারী তাঁর এই পত্রের মাধ্যমে সেদিন তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। গান্ধীর নেতৃত্বে সমকালীন কংগ্রেস রাজনীতি যে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্পর্কে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি, সেটা এর থেকে বেশ পরিষ্কার জানা যায়। সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে সমান অংশীদাররূপে থাকাকে স্বাধীনতা বলে না, এটা সেদিনের কংগ্রেস নেতারা যে বুঝে উঠতে পারেন নি, তা রাসবিহারীর চিন্তায় ধরা পড়েছিল বলেই না তিনি গান্ধীকে এই পত্রখানি লিখবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, ভারত ত্যাগ করেও ভারতের স্বাধীনতার চিন্তা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেন নি। রাসবিহারীর এই পত্রের সাত বৎসরকাল পরে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সর্বপ্রথম গৃহীত হয়। রাসবিহারী তাঁর পত্রখানি শেষ করেছেন এই বলে, "স্বাধীনতা ও দাসত্ব এক সঙ্গে থাকতে পারে না। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায়, তাকে সম্পূর্ণভাবেই ব্রিটিশের সঙ্গে সর্বপ্রকার

সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।" গান্ধী-নেতৃত্বের উপর তিনি আস্থা পোষণ করতেন বলেই ভারতে তাঁর অভ্যুদয়ের প্রাক্কালেই জাপান থেকে তিনি তাঁকে এই পত্রখামি লিখে থাকবেন। প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে স্বাধীনতা সম্পর্কে যে কোনো প্রকাব anomaly বা অস্বাভাবিকতার স্থান নেই—রাসবিহারীর এই পত্রখানিই তার একটি অভ্রান্ত নিদর্শন বহন করছে।

তেরো

জাপানে অবস্থানকালে রাসবিহারীর জীবনযাত্রার একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরই এক জাপানী ছাত্র, জেনইচি সুজুকি। বর্তমানে ইনি টোকিওর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। এখানে তাঁর সেই বিবরণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম। পাঠক দেখতে পাবেন যে, ভারত ত্যাগ করে যাওয়ার পর ভারতের স্বাধীনতার চিন্তাই এই নির্বাসিত বিপ্লবীর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিস্টার সুজুকি লিখেছেন ঃ

"আমার বয়স যখন ষোল বছর তখন থেকেই রাসবিহারী বসু আমার শিক্ষক ছিলেন। আমরা তাঁকে ভারতের একজন নেতা ও ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের জনক বলে জানতাম। আমি যখন কোকুহিকান স্কুলের একজন ছাত্র ছিলাম, তখন সেখানে তিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ঐ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পরেও আমি চিরকাল তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করেছি। তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি এবং এর দ্বারা আমি জীবনে বহুল পরিমাণে উপকৃত হয়েছি। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনি তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল আমি যে এশিয়া তথা জাপানের জাতীয় আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পেরেছি, এ শুধু তাঁরই শিক্ষার গুণে।

"আমি যখন মিস্টার বসুর কাছ থেকে ইংরেজীতে পাঠ গ্রহণ করতাম তখন তিনি আমাকে এই পরামর্শ দিতেন যে জাপানী ভাষায় ইংরেজীর অনুবাদ অপেক্ষা আমি যেন ইংরেজী ভাষায় জাপানীর তর্জমার দিকে বিশেষ মনোযোগী হই। তিনি নিজেও ঘণ্টার পর

ঘণ্টা ধরে ইংরেজীতে জাপানীর অনুবাদ করতেন। জাপানী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল জন্মেছিল। আমি যখন স্নাতক হই তখন মিস্টার বসু ওকুবোর সন্নিকটে 'Ajia-Go' (এশিয়ার কেন্দ্র) এই নাম দিয়ে একটি হলঘর স্থাপন করেছিলেন। ভারত থেকে সমাগত পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানের জন্যই তিনি এই আবাসগৃহটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন বিষণ সিং ও শামসের সিং ও আরো তিন-চারজন ভারতীয় আমেরিকা থেকে জাপানে এসে মিস্টার বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ; এঁরা সকলেই গদর পার্টি বা ভারতীয় স্বাধীনতা দলের সভ্য ছিলেন। টোকিওর সন্নিকটে এবিসুতে 'এবিসু ক্লাবে' এঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে শামসের সিং-এর বয়স ছিল ষোল ; তাঁকে এবং অন্যান্য ভারতীয়দের জাপানী ভাষা শেখাবার জন্য মিস্টার বসু আমাকে আদেশ করেছিলেন। আমি প্রতিদিন ঐ ক্লাবে গিয়ে তাঁদের জাপানী ভাষা শিখিয়েছিলাম এবং এর বিনিময়ে তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের কাজে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

"মিস্টার বসু মাঝে মাঝে তোয়ামা-ভবনে যেতেন ; সেখানে মিস্টার তোয়ামার সঙ্গে নানাবিধ রাজনৈতিক আলোচনায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করতেন। ডাঃ ওকাওয়া কখনো কখনো ঐখানে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেন ও আলোচনায় যোগ দিতেন। ইনিও মিস্টার বসুর একজন অনুরাগী ছিলেন। এশিয়ার জাগরণ আর ভারতের স্বাধীনতা—এই ছিল আলোচনার বিষয়। বস্তুত এই একটিমাত্র বিষয় নিয়েই তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন। মিস্টার বসু যখন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য টোকিওর বাইরে যেতেন তখন তাঁর গৃহের ও পরিবারের তত্ত্বাবধান করার জন্য আমাকে অনুরোধ করতেন। যেহেতু বাড়িতে কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই থাকতেন সেইজন্য আমি

রাত্রে এসে পাহাড়া দিতাম। তখন তাঁর বাড়িতে দুইটি অবিবাহিতা তরুণী বাস করতেন—দুজনেই সহোদরা ছিলেন ; বর্তমানে এঁরা শ্রীমতী নিয়াকো সামায়ামা ও শ্রীমতী শিজুয়ে ওয়াতানাবে নামে পরিচিতা। এঁরা শুধু বাড়ির কাজকর্ম দেখতেন না, মিস্টার বসুর অফিসের কাজও করতেন। তাঁর পত্নী শ্রীমতী তোসিকো বসু ও এই তরুণী দুইজন —এই তিনজন মহিলা তাঁর যাবতীয় কাজের সহকারিণী ছিলেন এবং তাঁর বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কীয় কাজে এঁরা তিনজনেই তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করতেন। মিঃ বসুর প্রতি ঐ তরুণী দুইটির যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং তারা আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁর বাড়ির ও অফিসের কাজকর্ম করতেন। এঁরা এই পরিবারের প্রতি এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে, শ্রীমতী বসুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র-কন্যা দুটিকে লালন-পালন করার জন্য তাঁরা যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছিলেন। এঁদের স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে এই বালক-বালিকা দুইটি নির্বিঘ্নে মানুষ হতে পারত না।

"আমি দেখতাম ভারতের স্বাধীনতায় আগ্রহবান এমন বহুলোক ভারত থেকে আসতেন তাঁর সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে ও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে। যখন ব্রিটিশ দূতাবাসের নির্দেশে জাপ-সরকার মিস্টার বসুকে জাপান পরিত্যাগ করবার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর সেই বিপদের দিনে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল মিস্টার মিৎসুরু তোয়ামা, মিস্টার আর. উচিমা, মিস্টার ওয়াই. কুজু, ডাঃ ওকাওয়া এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট জাপানী ভদ্র-লোক। এঁরা সকলেই সমমর্মী ছিলেন। আজ এঁদের কেউ-ই জীবিত নেই। জাপানে তাঁর অন্যান্য রাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে মাসাৎসু তাসুয়োকা ও তাসুদিবো মাসিদা—এই দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাপানের লক্ষ লক্ষ লোক 'রাসবিহারী বসু' এই নামটির সঙ্গে সুপরিচিত এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তারা এই

নামটিকে মিলিয়ে মিশিয়েই নিয়েছিল। আজো তাই বহু জাপানীর স্মৃতিপটে এই নামটি অম্লান হয়ে আছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতীয়দের মধ্যে বুদ্ধ ব্যতিরেকে রাসবিহারী বসুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি জাপানীদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন ও জাপ-জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহানুভূতি পেয়েছিলেন। তিনি সর্বদাই বলতেন এবং ঘোষণা করতেন যে, তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল তাঁর মাতৃ-ভূমির স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত। তিনি যা বলতেন, কাজে তাই-ই পরিণত করেছিলেন। যে-সব জাপানী তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই এই কথা বলেছেন যে, ব্যক্তিগত জীবনে মিস্টার বসু ছিলেন সারল্য ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি এবং তিনি তাঁর সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দো-লনে এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলের জন্য তাঁর তহবিল সর্বদাই মুক্ত থাকত। তিনি একবার একপত্রে আমাকে লিখেছিলেন, 'সত্যই হলো ধর্ম'। জাপান ও এশিয়ার অন্তরকে তিনি তাঁর অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।"

ভারত ত্যাগের পর যখন থেকে তিনি জাপানে অবস্থান করতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন থেকেই রাসবিহারীর রাজনৈতিক চেতনা জাতীয়তার সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিকতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করতে থাকে। এর প্রথম আভাস আমরা পাই শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে লেখা একটি পত্রে। এই পত্রের তারিখ ১২ই এপ্রিল, ১৯২২ এবং এটি শচীন্দ্রনাথের 'বন্দী-জীবন' গ্রন্থে সন্নি-বেশিত হয়েছে। রাসবিহারী লিখেছেন : "আমাদের জীবন অনন্ত, সুতরাং কাজও অনন্ত। গুপ্তভাবে কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা এখন আর নাই এবং এবিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই সামান্য ছিল। আমরা ভারতের উপরেই আমাদের মনোযোগ দিয়া-

ছিলাম। কিন্তু এখন আমি আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করিয়াছি এবং ইহার ফলে আমার আগেকার ধ্যান-ধারণার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। স্মরণ রাখিও যে, আজ আমাদের বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও সুখ স্থাপন করাই ভারতের নিয়তি-নির্দিষ্ট লক্ষ্য। ভারতের স্বাধীনতা এই লক্ষ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র এবং ইহা ভারতের একমাত্র লক্ষ্য নয়।"

এই প্রসঙ্গে ঐ বছরের ৯ই জুলাই তারিখে শচীন্দ্রনাথকে লেখা রাসবিহারীর আর একখানি পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ "প্রিয় শচীন, গতকাল তোমার পত্রখানি পাইয়াছি। আমার পূর্ব-পত্রে আমি তোমাকে পরিষ্কারভাবেই জানাইয়াছি যে, বর্তমানে আমার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারলাভ করিয়াছে এবং পূর্বপত্রে আমি তোমাকে ইহার আভাস দিয়াছি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই। কারণ সমগ্র পৃথিবীর নবজাগরণের জন্য ভারতের স্বাধীনতা অপরিহার্য। তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তি শেষ কথা নয়—ইহা লক্ষ্য সাধনের একটি উপায় মাত্র এবং সেই লক্ষ্য হইল—জঙ্গীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন ও আমাদের সকলের বাস করিবার জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করা। ইহাই ভারতের ব্রত।······আমি জাপানকে ভালবাসি এবং এখন আমি এই দেশকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন এশিয়ার স্বাধীনতার স্বপক্ষে সে দাঁড়াইবে। আমি যখন এদেশে প্রথম আসিয়াছিলাম তখন ভারতের অবস্থা সম্পর্কে জাপানীদের ধারণা খুব সামান্যই ছিল। প্রধানত আমাদের প্রচেষ্টায় আজ প্রত্যেকটি জাপানী খুব গভীরভাবে ভারতের ঘটনাবলীর ধারা পর্যবেক্ষণ করিতেছে। মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া উকিল, পার্লামেণ্টের সদস্য, সাংবাদিক ও ছাত্র —বহু জাপানী এখন আমার বন্ধু। জাপানী ভাষায় গান্ধী ও ভারতের

রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং মাসিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রিকাগুলিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এখন নিয়মিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে।…আগামীকাল ভারতীয় অবস্থা সম্পর্কে আমার তিনটি বক্তৃতা দিবার কথা আছে।… জাপানী-দের সহৃদয়তা ও ঔদার্য ভিন্ন আমি কবেই মারা যাইতাম। তুমি জানিতে চাহিয়াছ, আমি কবে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিব—কিন্তু ভাই, তুমি জানিয়া রাখো যে যতদিন না ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত আমি ফিরিব না। তোমার বৌদি বাংলা শিখিতেছেন।"

দেখা যাচ্ছে যে, নির্বাসিত বিপ্লবী রাসবিহারী জাপানে গিয়ে শুধু নিষ্ফল হা-হুতাশ করে দিনাতিপাত করেন নি অথবা বিবাহ করে নিশ্চিন্ত আলস্যে কালক্ষেপ করেন নি। বরং সম্পূর্ণ অপরিচিত ঐ দেশে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার অল্পকাল মধ্যেই তিনি এক প্রচণ্ড কর্মের আবর্ত সৃষ্টি করেছিলেন এবং ভারতের অনুকূলে জাপানের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য অশ্রান্তভাবে তাঁর লেখনী ও মস্তিষ্ক দুই-ই পরিচালনা করেছিলেন। সেদিন এই জাতীয় প্রচারকার্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং তিনিই ছিলেন এই দুরূহকার্য সম্পাদনের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। সেদিন তিনিই ছিলেন জাপানে পরাধীন ভারতের বে-সরকারী রাষ্ট্রদূত; তাঁর এই দৌত্যকার্যের সম্পূর্ণ মূল্যায়ণ আমরা বোধ হয় আজো করে উঠতে পারি নি। একথা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, বিগত শতাব্দীর শেষপাদে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় গিয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারতের অনুকূলে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও তাঁর পরে স্বামী অভেদানন্দ যে রকম অশ্রান্ত প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন, এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে একা রাসবিহারী জাপানে ভারতের অনুকূলে ঠিক সেই রকম প্রচারকার্যই চালিয়েছিলেন। এর জন্য যে অসীম ধৈর্য, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন

চিন্তার প্রয়োজন ছিল, তাঁর মধ্যে তার কিছুরই অভাব ছিল না। ভারতের বিপ্লবী সমাজে রাসবিহারীর শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

বলেছি, যে জাপান তার কোলে এই বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়েছিল, যে জাপানের সেই মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিক তোয়ামা তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, যে জাপানের এক সম্ভ্রান্তবংশের দুহিতা, সামাজিক নিগ্রহ উপেক্ষা করে তাঁকে স্বামী হিসাবে স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন, সেই জাপানকে রাসবিহারী তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলেই জ্ঞান করতেন। তাঁর মতো আর কোনো ভারতীয় এই দেশকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সনে তাঁর ৭৪তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে কলিকাতায় অবস্থিত জাপানের কনসুলেট-জেনারেল যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "যাঁরা জাপানে জাপানীদের মতো জীবনযাপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাসবিহারী বসু ছিলেন অন্যতম। বহু বছর ধরে তিনি জাপানে ছিলেন। তিনি ছিলেন সমস্ত জাপান ও জাপানবাসীর অন্তরঙ্গ বন্ধু, জাপানী কৃষ্টি ও সংস্কৃতিরই তিনি শুধু ছাত্র ছিলেন না, সুখে দুঃখে তিনি ছিলেন জাপানী প্রতিবেশীর সহায়ক ও পরামর্শদাতা।"

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৯২৪ সনে দ্বিতীয়বার জাপান পরিদর্শনে গিয়ে স্বচক্ষে সেই দেশে রাসবিহারীর প্রভাব-প্রতিপত্তি চাক্ষুষ করে এসেছিলেন এবং সেখানে তিনি বসু-দম্পতির আতিথ্যও গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে ফিরে তিনি রাসবিহারী সম্পর্কে যে-সব উক্তি করেছিলেন বলে জানা যায়, রবীন্দ্র-জীবনীতে তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

যাঁকে তিনি তাঁর জীবনসঙ্গীনীরূপে লাভ করেছিলেন, সোমা-দুহিতা সেই কুমারী তোসিকো শুধু যে বিদুষী ছিলেন তা নয়, তিনি সর্বাংশেই তাঁর স্বামীর যোগ্য ভার্যা হতে পেরেছিলেন। তাই যখন এই জাপ-

দুহিতার সঙ্গে তিনি পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তখন রাসবিহারী মনে মনে এই আশা পোষণ করে থাকবেন যে তোসিকোর সাহচর্যে তিনি তাঁর জীবনব্রত—ভারতের স্বাধীনতা—সফল করতে পারবেন। তাঁর সেই আশা যে কল্পনা মাত্র ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি তাঁদের স্বল্পকালস্থায়ী দাম্পত্যজীবনে পেয়েছিলেন। তাঁর স্বামী একজন ভারত-বিখ্যাত বিপ্লবী, এ তিনি বিলক্ষণ জানতেন, তাই স্বামীর জীবনাদর্শকে পত্নীরূপে এই জাপ-দুহিতা নিজের জীবনে অল্পদিনের মধ্যেই যে ভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা দেখে রাসবিহারী নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন। আমরা কল্পনা করতে পারি, কতদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিজন্য তিনি ভারত ত্যাগ করে এই সূর্যোদয়ের দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, কিজন্যই বা আট বৎসরকাল এইখানে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, এমন কি মাথার উপর নিশ্চিত মৃত্যুর উদ্যত খড়্গ নিয়ে তিনি অন্ধকারে আত্মগোপন করে বাস করেছেন এবং কেন-ই বা তিনি তোসিকোকে বিয়ে করে জাপ-নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন—এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে যখনি তিনি আলোচনা করেছেন, রাসবিহারী সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন যে ঐসব কথা শুনতে শুনতে তোসিকোর সুন্দর মুখখানি আবেগে-অনুরাগে উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি অনুভব করতেন যে তাঁর জীবনব্রত তোসিকোরও জীবনব্রত হয়ে উঠেছে। অনুভব করতেন যে, জাপানের এই চারু চেরীফুলটি সত্যিই বাংলার রাঙাজবায় পরিণত হয়েছেন।

বিয়ের পর যখন মাত্র সাত বছরের মধ্যে তিনি সেই গুণবতী স্ত্রীকে হারালেন তখন পত্নীর পবিত্র স্মৃতিকে অন্তরে ধারণ করে বিপ্লবী বীর স্বীয় লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হলেন। বিপ্লবীর জীবনে বিলাপের অবকাশ কোথায়? দাম্পত্য-জীবনের সুখ-স্বপ্ন শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। রাসবিহারী ভারতের স্বাধীনতার. চিন্তায় মগ্ন হলেন। ভারতে তখন

নবপর্যায়ে মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে—সাগর-তরঙ্গে ভেসে এলো সেই বার্তা জাপানে তাঁর কাছে। ১৯২৬ সনে রাসবিহারী জাপানে সমস্ত ভারতীয় তরুণদের জানালেন আবেদন এবং সেই একই সঙ্গে ভারত ও জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করবার উদ্দেশ্যে তিনি আবেদন জানালেন সমস্ত জাপানী ভাই-বোনদের প্রতি। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ ওকাওয়া, পিকিং-এর ইউনিয়ন অব এশিয়া প্রসারিত করলেন সহযোগিতার হস্ত। এইভাবে আয়োজনের প্রাথমিক পর্ব শেষ করে রাসবিহারী ১৯২৬ সনের পয়লা আগস্ট তারিখে নাগাসাকিতে এশিয়াবাসীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে এগারজন চীনা, আটজন ভারতীয়, একজন আফগানী, একজন ভিয়েৎনামী, একজন ফিলিপিনো, কুড়িজন জাপানী, মোট বিয়াল্লিশজন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন।

সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে রাসবিহারী একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এশিয়ার জনসাধারণের জন্য এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি ভারত-সম্পর্কে বললেন: "India was one of the three big countries and especially her philosophy is the glory of all human history of culture." এই এশীয় ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন: "The Union now we are going to establish is to shape a new form of our Eastern civilization. Its basis is on the pure faith and love for Asia. Let us unite and do our best to establish this union at all cost and let us make a big contribution to the happiness of all humainty in propagating our aims and objects all over the world."

এই যে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান তিনি সেদিন জানিয়েছিলেন

এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন যে রাসবিহারী বসুকে আমরা পাই সেই মানুষটি কিভাবে অতীতের জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত বিপ্লবীর আবরণ ছিন্ন করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর জীবনেতিহাসের সেই অধ্যায়টি আজো বোধ হয় তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে অপরিজ্ঞাত রয়ে গেছে। এর পর থেকেই তাঁর কর্মের পরিধি ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। তিনি জাপানে 'Indian Society' এই নাম দিয়ে একটি সমিতি সংগঠন করেন এবং তখন জাপানে যেসব ভারতীয় তরুণ শিক্ষার্থী অবস্থান করতেন তাঁদের নেতারূপে তিনি পরিগণিত হন। ১৯৩১ সন থেকেই তিনি জাপানে প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে উৎসবটি পালন করতেন ও সেই উপলক্ষ্যে সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হতো, প্রতি বৎসরই তিনি তার অনুলিপি এই দেশে পাঠাতেন। ১৯৩০ সনে গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সংবাদ যখন টোকিওতে তাঁর কাছে গিয়ে পোঁছল, তখন রাসবিহারী সেই আন্দোলনের সফলতা কামনা করে গান্ধীকে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন।

বলেছি, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই রাসবিহারী তাঁর চারদিকে একটা প্রচণ্ড কর্মের আবর্ত সৃষ্টি করেছিলেন। সে কর্মের বিরাটত্ব, আজ এই সুদূরকালের ব্যবধানে, আমরা সহজে ধারণা করতে পারব না। ১৯৩৩ সনে তিনি 'Villa Asians' এই নামে টোকিও শহরে এশীয় ছাত্রদের জন্য একটি আবাস-গৃহ স্থাপন করেন এবং আট বছরকাল যাবৎ তিনি স্বয়ং এটি পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীদের মধ্যে অন্যতম এ. কে. পাণ্ডে ছাত্রাবস্থায় এইখানে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইখানে প্রতি রবিবার ছাত্রদের সঙ্গে রাসবিহারী এক বৈঠকে মিলিত হয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। সেসব আলোচনার মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাই ছিল মুখ্য বিষয়।

এখানে তিনি ভারতীয় খাদ্য-পদ্ধতি প্রচলিত করেন এবং স্বয়ং রান্নার কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। জাপানী বন্ধুদের নিয়ে 'ইন্দো-জাপানীজ ফ্রেণ্ডস সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেছিলেন।

এই সময়ে বহুবিধ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্মেলনের কাজে তিনি সমগ্র জাপান পরিভ্রমণ করতেন এবং কোরিয়াতেও গিয়েছিলেন। জাপানী ভাষায় তিনি অনর্গল বলতে পারতেন। সর্বত্রই তিনি ভারত ও জাপানের প্রাচীন সম্পর্কের কথা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারা এবং ইংরেজ শাসনের স্বৈরাচারের কথা আলোচনা করতেন। ১৯৩৪ সনে কোরিয়াতে গিয়ে তিনি সেখানকার বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে জানা যায়। জাপানের একাধিক পত্র-পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি স্বয়ং *New Asia* নাম দিয়ে একখানি উচ্চাঙ্গের ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন এবং *Asian Review* নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি ছিলেন অন্যতম। এ ছাড়া ১৯২৯ থেকে ১৯৪৪ সন পর্যন্ত জাপানী ভাষায় রচিত তাঁর পুস্তকাবলীর সংখ্যা প্রায় কুড়ির কাছাকাছি। ১৯৪৩ সনে জাপানী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র অনুবাদ ঐ ভাষায় বোধ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম।

চৌদ্দ

১৯৩৫।

দেখতে দেখতে তাঁর নির্বাসিত জীবনের বিশ বছর অতিক্রান্ত হলো জাপানে; বিশ বছর! আজ তিনি পঞ্চাশের কোঠায় পদার্পণ করেছেন। প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে উপনীত হয়ে এখন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, আমি এখন পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছলাম। আজ পর্যন্ত তো কিছুই করে উঠতে পারলাম না। জানি না, কবে আমার স্বপ্ন চরিতার্থ হবে আর কি ভাবে তা হবে। আমি কি এই স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারব? অমনি বিপ্লবীর অন্তরের অন্তস্থল থেকে উত্তর আসে: পঞ্চাশ বছর কি? এই তো কাজ আরম্ভ করার সময়। "সুদিন আসিবে নিশ্চয়ই"—কান পেতে যেন তিনি শুনলেন এই দৈববাণী। একদিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে অধ্যাপক ওকাওয়ার সমভিব্যাহারে একটি ছোট্ট নৌকা করে জাপান সাগরের বুকে পরিভ্রমণ করতে করতে অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভার দিকে রাসবিহারী তাকিয়ে আছেন অপলক নেত্রে। সাগরবক্ষে দুলছে সেই রক্তসূর্যের প্রতিবিম্ব। অনেকক্ষণ পরে আবিষ্টের মতো তিনি যেন বলে উঠলেন—জীবনের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, নির্বাসিত জীবনেরও বিশ বছর অতিক্রান্ত হলো, এখনো আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হলো না। এই বলে নৌকার মধ্যে বসে তিনি বালকের মতো ক্রন্দন করতে লাগলেন। বেদনা-মথিত বিপ্লবীহৃদয়ের সেই আকুতি বুঝি সেদিন ইতিহাস-বিধাতা অলক্ষ্যে থেকে শুনতে পেলেন। এর ঠিক দু'বছর পরেই চীন-জাপান সম্পর্কের আকস্মিক পটপরিবর্তন নিয়ে এলো তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রত্যাশিত সুযোগ। অতঃপর আমরা এই বিপ্লবী মহানায়কের জীবনের সেই গৌরবময় অধ্যায়টি আলোচনা করব। তাঁর রাজ-

নৈতিক প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় তাঁর জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে। তাঁর জীবনের এই শেষ সাত-আট বছর কালের ইতিহাস আমরা কালানুক্রমিক পর্যায়ে অনুসরণ করব।

১৯৩৭। আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাইসেকের জাপ-বিরোধী নীতির প্রতিবাদে জাপান চীন আক্রমণ করল। তখন মার্কিন সরকারের লুব্ধ দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে চীনের উপর। তার শিল্পজাত বিপুল পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চীনের বাজারের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য সে বহুদিন থেকেই অভিলাষী ছিল এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই সে চিয়াং কাইসেকের গভর্নমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিল। চীন-জাপান সংঘর্ষের পরিধি তখন থেকেই বিস্তারলাভ করতে থাকে। রাসবিহারী এই সংঘর্ষের মধ্যে তাঁর এতদিনের পোষিত লক্ষ্য সাধনের যেন সুযোগ পেলেন। তখনি তিনি 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ' নাম দিয়ে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করলেন। ত্রিশজন ভারতীয় এই সময়ে একদিন টোকিওর রেনবো ক্লাবে এই উপলক্ষ্যে মিলিত হয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবের একটি কপি জাপানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয় আর একটি প্রেরিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির নিকট। বিপ্লবীর কণ্ঠে শোনা গেল রণহুঙ্কার: "এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া—শ্বেতাঙ্গরা ফিরে যাও।" কংগ্রেসের 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব এর পাঁচ বছর পরের ঘটনা। দেখা যাচ্ছে, এশিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ইংরেজকে চরম পত্র গান্ধীর অনেক আগে দিয়েছিলেন প্রথমে রাসবিহারী। পরে এরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনেছিলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বলিষ্ঠ কণ্ঠে। সেদিন এশিয়ার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এ ছিল এক সম্পূর্ণ নূতন আওয়াজ। লীগের কাজ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বছরের ২৮শে অক্টোবর টোকিওতে নিখিল এশিয়া যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো; এই সম্মে-

লনের নেতৃত্ব করেছিলেন রাসবিহারী বসু। ইন্দোনেশিয়া, মাঞ্চুকুয়ো, মঙ্গোলিয়া, আরব, থাইল্যাণ্ড ও জাপানস্থ ভারতীয় যুবক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এরপর রাস-বিহারীকে আমরা দেখতে পাই ঝটিকার বেগে তিনি কোবে, তোবাতা, সিয়োতো প্রভৃতি জাপানের প্রধান প্রধান শহরে লীগের বাণী প্রচার করতে থাকেন। সর্বত্রই প্রচুর শ্রোতার সমাগম হতো। "এশিয়া-বাসীদের জন্য এশিয়া"—তাঁর এই রণহুঙ্কারে সমগ্র জাপান যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে চিয়াং কাইসেকের সরকার চুংকিঙ-এ এসে আশ্রয় নিয়েছে। রাসবিহারী যখন জাপানে ঐ আওয়াজ তুলেছেন, ভারতে সুভাষচন্দ্র বসু তখন ঠিক অনুরূপ একটি ঘোষণা দিয়েছেন: "Our last step to be taken is to cut off present relations between the British kingdom and India." ইতিহাসের গতিপথে এই দুই নেতার কণ্ঠে উচ্চারিত এই বাণী কি তুমুল তরঙ্গ তুলেছিল, তা আজ ইতিহাসেরই একটি অধ্যায়রূপে পরিগণিত হয়েছে। জাপানের চীন আক্রমণের ফলে সেদিন রবীন্দ্রনাথের চক্ষে জাপানকে মনে হয়েছিল হিংস্র, রাজ্য-পিপাসু। প্রকাশ্যে তিনি এর একটি প্রতিবাদ করেন এবং তার ফলে ভারতে ঐ সময়ে (১৯৩৮) একটা প্রবল জাপ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। রাসবিহারীকে এজন্য অসুবিধায় পড়তে হয়, কারণ তখন তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই ভারতীয়দের মধ্যে ঐ জাপ-বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করেন। সমগ্র বিষয়টি স্বয়ং জাপানে এসে অনুধাবন করার জন্য তিনি ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখেছিলেন। কবি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ভারতের কোনো কোনো পত্রিকায় রাসবিহারীর বিরুদ্ধে এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল যে, তিনি জাপানী সাম্রাজ্য-বাদের পক্ষ নিয়ে চীনের উপর তাদের আক্রমণ সমর্থন করেছেন

এবং কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় নেতাদের নিন্দা করেছেন। তিনি জাপানের আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি, তাই তাঁকে দিয়ে জাপান গভর্নমেণ্ট ভারতের নিন্দাঘোষণা করিয়ে নিয়েছে—এমন কথাও তখন শুনা গিয়েছিল। চীন-জাপান সংঘর্ষের মূল কারণ যে আমেরিকা, সেটা অবগত না হয়েই অথবা না বুঝেই কবির ঘোষণার অনুসরণ করে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় রাসবিহারী সম্পর্কে ঐ সময়ে যেসব বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল আজ তার প্রতিবাদ হওয়া দরকার। তিনি কংগ্রেস নেতাদের বা রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করবেন অথবা জাপ-সরকার আশ্রিত ব্যক্তিরূপে তাঁকে তাদের প্রচারের স্বপক্ষে ব্যবহার করবে—রাসবিহারীর চরিত্রের সঙ্গে এ জিনিস যেন কিছুতেই খাপ খায় না। তা যদি সম্ভব হতো তাহলে সেই মহান বিপ্লবীর সমগ্র জীবনসাধনাই যে মিথ্যা হয়ে যায়।

এই বছরেরই আর একটি ঘটনা।

১৯৩৭ সনের ১০ই মে অন্তরীণ অবস্থা থেকে দীর্ঘ তেরো বৎসরকাল পরে বিনায়ক দামোদর সাভারকার বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করলেন। আন্দামান থেকে মুক্ত হওয়ার পর এতকাল তাঁকে বোম্বাইয়ের রত্নগিরিতে আটক রাখা হয়েছিল। টোকিওতে বসে রাসবিহারী যখন সাভারকারের মুক্তি-সংবাদ জানতে পারলেন তখন তিনি যারপরনাই আনন্দিত বোধ করলেন, কারণ মহারাষ্ট্রের এই নির্ভীক সন্তানকে তিনি ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের এক অদ্বিতীয় যোদ্ধারূপে স্বীকার করতেন। তাই এই সহকর্মীর মুক্তি-সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাভারকারের উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে তিনি সেদিন বলেছিলেন: "In saluting you, I have the joy of doing my duty towards one of my elderly comrades-in-arms. In saluting you, I am saluting the symbol of sacrifice itself." এমন মহত্ব, এমন ঔদার্য একমাত্র রাসবিহারী-চরিত্রেই সম্ভব।

বিপ্লবী সাভারকার বিপ্লবী রাসবিহারীকে চিনতেন ও তাঁর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের জন্য তিনি তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর মুক্তিলাভের পর যে বছর কলিকাতায় হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন হয়, সাভারকার ছিলেন তার সভাপতি। ঐ অধিবেশন হয়েছিল কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কে। সেই স্মরণীয় অধিবেশনে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে জাপানে রাসবিহারীকে সাভারকার একখানি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রের শেষভাগে এই লাইনটি ছিল : "ভারতবর্ষ এই সংকটকালে আপনার নেতৃত্ব কামনা করছে। আমরা সাগ্রহে আপনার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় আছি।" কিন্তু আইনের বাধা ছিল বলে রাসবিহারীর পক্ষে তখন আসা সম্ভব হয় নি।

১৯৩৯।

বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সহসা পট-পরিবর্তন হলো।

য়ুরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল।

এই সংবাদ টোকিওতে বসে পেলেন রাসবিহারী। অমনি তাঁর মন ফিরে যায় সেই সুদূর অতীতে, সেই পঁচিশ বছর আগে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল। সেদিন তিনি ছিলেন তরুণ যুবক এবং সেদিনও তিনি ঐ সুযোগ নিয়ে ভারতে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করেছিলেন। সে আয়োজন ব্যর্থ হলো। ভারত ত্যাগ করে তিনি চলে এলেন জাপানে। আজ যখন তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছেন তখন আবার এসেছে সেই সুযোগ। এ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। হয়ত এই সুযোগেই আসবে ভারতের স্বাধীনতা। "One fight more; the last and the best."—এই কথা তিনি বললেন নিজের মনে।

ঐ একই বছরে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সংবাদ পেলেন রাসবিহারী। এ সংবাদ যুদ্ধের কিছু আগের ঘটনা। সংবাদ পেলেন কংগ্রেস সভাপতিরূপে

সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে একটি চরমপত্র বা Ultimatum দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। ঐ সময় টোকিওতে বসে রাসবিহারী যখন কংগ্রেস সভাপতির ভাষণের মধ্যে পাঠ করলেন যে, য়ুরোপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এইবার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে স্বরাজ দিতে বাধ্য করতে হবে ("To force the issue of Swaraj with the British Government"), তখন তাঁর সমস্ত হৃদয়-মন আন্দোলিত হয়ে উঠল। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এমন একটি দাবীর প্রতীক্ষাতেই তো তিনি এতকাল নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। তারপর ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের চক্রান্তে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে অপসারণের সংবাদ যখন রাসবিহারী পেলেন, তখন তাঁর মন বলে উঠল, ভারতের স্বাধীনতা এবার অবধারিত। তখন থেকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো একমাত্র সুভাষচন্দ্রের উপর এবং তখন থেকেই তিনি তাঁর প্রত্যেকটি গতিবিধি, তাঁর উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা—যা তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারতেন বা অন্য সূত্রে অবগত হতেন—গভীরভাবেই অনুধাবন করতে থাকেন। এই সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে তখন থেকেই যে এই বিপ্লবীর মনে নব-পর্যায়ে ভারত উদ্ধারের চিন্তা আবর্তিত হয়েছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে জাপানে গিয়ে অবধি রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। সিবিল-সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি দেশসেবার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করেছেন; ১৯২৮ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে তিনিই G.O.C. রূপে এক বিরাট স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করেছেন—ইংরেজ রাজশক্তি তাঁকে বার বার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, দেশান্তরে পাঠিয়েছে, তবু তাঁর মনের অমিত তেজকে কিছুতেই দমন করতে পারে নি।

তিনি একাই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের আপোষমূলক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন—ভারতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে ত্রিপুরী-পর্ব পর্যন্ত সমস্ত সংবাদই যে রাসবিহারী রাখতেন এ অনুমান নয়, সত্য কথা। কারণ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে তিনি একজন সত্যকার বিপ্লবীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

১৯৪০, জুন মাস। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে তাঁর নিজস্ব একটি নূতন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর অল্পকাল পরেই সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি সম্মেলন হয়। য়ুরোপে তখন যুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। সেই সম্মেলনেই ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন : "With every blow that she receives in Europe the Imperialist might of Britain is bound to losen its grip on India." টোকিওতে বসে এই সংবাদ পাঠ করে রাসবিহারী উল্লসিত হয়ে নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন—এ তো আমারই মনের কথা। তিনিও তো সুনিশ্চিত ধারণা করেছেন যে, এবারকার যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত এবং সেই সঙ্গে ভারতের উপর ইংরেজের পৌনে দুশো বছরের বজ্রমুষ্টি শিথি·ᐩ হতে বাধ্য। তখন থেকেই বীর সাভারকারের মাধ্যমে তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত পত্রদ্বারা যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকেন। তাঁদের সেইসব পত্রাবলী অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রয়েছে। এইগুলি এখন প্রকাশিত হওয়া দরকার।

১৯৪১, ৮ই ডিসেম্বর।

জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

জাপানের নৌ-বাহিনী পার্ল হার্বার আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হলো। জাপানী স্থল-বাহিনী প্রচণ্ডবেগে মালয় আক্রমণ করল। ঐ বছরের ২৭শে ডিসেম্বর রাসবিহারী জাপানে আটজন ভারতীয়দের নিয়ে একটি সভার আয়োজন

করলেন। ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪২ তারিখে তিনি এশিয়া ভূখণ্ড থেকে এ্যাংলো-আমেরিকান প্রভুত্বের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে টোকিওতে একটি এশিয়ান ইণ্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সংগঠন করলেন এবং সপ্তাহকাল পরে ওসাকাতে এশিয়ান পিপলস্ কনফারেন্স হলো। এই সময়ে তিনি তোয়ামার মাধ্যমে জাপানের সৈন্যবাহিনীর সদর-দপ্তরের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

অতঃপর ঘটনাস্রোত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়ে চলল।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২। সিঙ্গাপুরের পতন হলো। হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী জাপানী সৈন্যবিভাগের সদর-দপ্তরের মেজর ফুজিয়ারা কয়েকজন ভারতীয়কে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তিনি ভারতীয়দের দ্বারা একটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী (Indian National Army বা I. N. A.) সংগঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। জাপানী সৈন্যবিভাগের সদর-দপ্তরের অনুরোধে রাসবিহারী মেজর ফুজিয়ারার হাতে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনাটি দিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল অবিলম্বে মালয়ে একটি ভারতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এবং সেই একই সঙ্গে সকল ভারতীয়দের সহযোগিতায় একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা। সেদিন এই বিষয়টি নিয়ে মেজর ফুজিয়ারার সঙ্গে রাসবিহারীর যে আলোচনা হয়েছিল তার সার কথা এই যে, ভারতের স্বাধীনতা ভারতের ভিতরে ও বাইরে ভারতীয়গণের দ্বারাই অর্জন করতে হবে। বহু বিতর্ক ও আলোচনার পর রাসবিহারী বসুকেই এই বিষয়ে সমস্ত কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। এই বিরাট দায়িত্ব যখন তাঁর উপর ন্যস্ত হয় তখন তিনি এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি করেছিলেন : "We shall never be marionette of Japan. We co-operate with the Japanese Army but we will never allow the Japanese to interfere in the political affairs of

our Indian Independence League." পাঁচ বছর আগে চীন-জাপ বিরোধের সময় 'ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ' (I. I. L.) নামে যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির সূচনা মাত্র হয়েছিল, আজ যেন সেটি একটি ঐতিহাসিক পরিণতি লাভ করল। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, ঐ সময়ে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোও একটি ঘোষণায় বলেছিলেন: "Indians will free India and Japan will do her best to help India's patriotic actions." বলা বাহুল্য, জাপ-সরকারের এই ঘোষণার পেছনে রাসবিহারীর যথেষ্ট হাত ছিল।

এখানে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কথা একটু আলোচনা করা দরকার। এটাই ছিল রাসবিহারীর রাজনৈতিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান এবং তিনি যে একজন কতবড়ো দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তারই অভ্রান্ত নিদর্শন এই লীগ। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই ইহার জন্ম। ঐদিন তিনি হোটেল সান্নোতে সমবেত সাংবাদিকদের সামনে যে ঘোষণাটি দিয়েছিলেন তার মধ্যে এর কথা ছিল। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে জাপানে তখন যে-কয়টি ভারতীয় দল গঠিত হয়েছিল সেইগুলিই এখন একত্র করে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ' এই নূতন নামকরণ করা হয়। তারপর ১৯৪২ সনের জুন মাসে ব্যাঙ্ককে সপ্তাহকালব্যাপী যে প্রতিনিধি সম্মেলন হয়েছিল, ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রকৃত উদ্বোধন সেই সম্মেলনেই হয়েছিল, বলা চলে। জাপান, মাঞ্চুকুও, হংকং, ব্রহ্মদেশ, বোর্নিও, জাভা, মালয় ও শ্যাম থেকে একশত প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে। এই সম্মেলনেই রাসবিহারী বসু সর্ববাদীসম্মতিক্রমে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। সে-দিনটি ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয়, এবং সবচেয়ে গৌরবময় দিন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও ঐ দিনটি স্মরণীয় বলে গণ্য হওয়া উচিত। সিঙ্গাপুর হলো এই সংঘের প্রধান কর্মস্থল। পূর্ব-

এশিয়ার সমস্ত দেশে এর শাখা স্থাপিত হয়েছিল। সেই বছরেই বিশ্বসমক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অস্তিত্ব ঘোষিত হয়। বার্লিনে বসে সেই শুভ সংবাদ পেলেন সুভাষচন্দ্র। সেখান থেকেই তিনি একটি শুভেচ্ছাসূচক বাণী প্রেরণ করলেন।

লীগ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই রাসবিহারী গঠন করলেন 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি,' পরবর্তীকালে যা ইতিহাসে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এই নামে পরিচিত হয়েছে। ব্যাঙ্কক সম্মেলনেই লীগের কার্যপদ্ধতি স্থির হয় ও এর একটি কর্মপরিষদ (Council of Action) গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী বসু এবং সভ্য ছিলেন চারজন যথা,—এন. রাঘবন, কে. পি. কে. মেনন, ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও কর্ণেল জিলানী। অতঃপর এই কর্মপরিষদ ইতিহাস-বিখ্যাত I. N. A. বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করার ভার গ্রহণ করেন। মালয়ে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের সঙ্গে মেজর ফুজিয়ারার সাক্ষাতের পর যে আলোচনা হয় তাতে স্থির হয়, বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণ লীগের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সঙ্গে যোগ দেবেন। অতঃপর ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের অধিনায়কত্বে বাহিনী সংগঠনের কার্য আরম্ভ হয়। জাপান সরকারের সহযোগিতায় অথচ ভারতের স্বার্থ ও মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেই রাসবিহারী যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই এই লীগ ও ফৌজ গঠন করতে পেরেছিলেন তা সুভাষচন্দ্র স্বয়ং এসে চাক্ষুষ করেছিলেন। ১৯৪৪ সনের ৬ই জুলাই মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে রেঙ্গুন থেকে তিনি যে বেতার ভাষণটি দিয়েছিলেন তার মধ্যে "Japan has proved her sincerity by her deeds."—এই কথাটি ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, এই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হয়, তোয়ামা তখন টোকিওতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স অষ্টআশী বছর। মৃত্যুশয্যায় শুয়েই তিনি এইসব

সংবাদ পেয়েছিলেন। এই সময়ে একদিন দুইজন সহকর্মীর সঙ্গে রাসবিহারী তোয়ামার আশীর্বাদ নিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। এই প্রসঙ্গে ওসাওয়া তাঁর গ্রন্থে একটি চিত্তস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন। রাসবিহারী যখন তাঁর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন ও সম্পূর্ণ জাপানী প্রথায় মস্তক অবনত করলেন তখন সেই অশীতিপর বৃদ্ধের চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন, "অবশেষে সময় তাহলে এলো। ভারতের স্বাধীনতা তোমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন এখন সফল হতে চলেছে। আমি তো আশীর কোঠা পার হয়েছি, তবু মৃত্যুর পূর্বে আমি তোমার কর্মের সফলতা দেখে যেতে চাই।"

ঘটনাস্রোত তখন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

ইতিহাসের দিগ্বলয়ে তখন বহু-প্রত্যাশিত ভারতের স্বাধীনতা সূর্য উঠবার উপক্রম হয়েছে।

যৌবনের সতেজ উৎসাহ নিয়ে রাসবিহারী কর্মস্রোতে ঝাঁপ দিলেন এবং তখন কিছুদিনের জন্য তাঁর কর্মক্ষেত্র টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত করতে হয়। সেখানে তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। টোকিও ত্যাগ করে তিনি সিঙ্গাপুর চলে যাবেন, এই সংবাদ জানতে পেরে একদিন সন্ধ্যায় সোমা পরিবারের গৃহে তাঁর জন্য একটি অনাড়ম্বর বিদায়সভার আয়োজন হলো। তাঁর শ্বশুর আইজো সোমা জামাতাকে ঐ বিদায়সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। পুত্র মাসাহিদে ও কন্যা তেতেকু দু'জনেই তখন বয়োপ্রাপ্ত হয়ে মাতামহ ও মাতামহীর কাছে অবস্থান করছিল। পুত্রটি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়েছে। সেদিনের সেই বিদায়সভায় তাঁর শ্বশ্রুমাতা কোকো সোমা জামাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার যদি কিছু বলার থাকে, আমাদের কাছে তা বলে যেতে পারো।"

উত্তরে রাসবিহারী বললেন, "মা, আমি আমার সমগ্র জীবন ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছি। এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আমার জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। আপনারা মাসাহিদে ও তেতেকুকে মানুষ করেছেন, তাদের সম্বন্ধে আমার কোনো উৎকণ্ঠা নেই। তবে তেতেকুর বিয়ে হলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হতাম। মাসাহিদের জন্য চিন্তা নেই, সে পুরুষ মানুষ, সে একাই তার জীবন গড়ে তুলতে পারবে।"

বিদায়ের পূর্বে ঘরের একধারে একটি টেবিলের উপর রক্ষিত পত্নী তোসিকোর ফটোখানির সামনে নীরবে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ফটোর চারদিকে চেরীফুলের স্তবক সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। একটি সুন্দর ধূপাধারে জ্বলছে সুগন্ধী ধূপ। এই ধূপ তিনি দক্ষিণ ভারতবর্ষ থেকে আনিয়েছিলেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি। পিতাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার জন্য পুত্র মাসাহিদে এসেছিলেন স্টেশন পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিপ্লবীর এই বীরপুত্র পরে আজাদ ফৌজে সাব-লেফটেনাণ্ট হিসাবে নবম ট্যাঙ্কবাহিনীতে যোগদান করেন ও রণস্থলেই মৃত্যুকে বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যু রাসবিহারীর জীবনে আর একটি মর্মন্তুদ অধ্যায়।

পনেরো

১৫ই জুন, ১৯৪২, ব্যাঙ্ককে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের যে ঐতিহাসিক সম্মেলন (এটাকে দ্বিতীয় সম্মেলন বলা যেতে পারে; প্রথম সম্মেলন হয় টোকিওতে মার্চ মাসে।) হয়েছিল তার সভাপতিরূপে রাসবিহারী বসু যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেটিকে তাঁর বিপ্লবী-জীবনের একটি Political Will and Testament হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সুদীর্ঘ এই ভাষণের ছত্রে ছত্রে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রায় শতবর্ষের ইতিহাস যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই ভাষণের প্রারম্ভে সিপাহী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যেসব দেশপ্রেমিক আত্মদান করে এই ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে যেমন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তেমনি শ্রদ্ধা তিনি মহাত্মা গান্ধীকেও জানিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাটির মধ্যে রাসবিহারীর গভীর ইতিহাসবোধের পরিচয় যেমন আছে তেমনি আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক মুক্তি আন্দোলনের একটা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। মোট কথা, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার নিদর্শন হিসাবে এই বক্তৃতাটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সন্নিবেশিত হওয়ার দাবী রাখে। পূর্ব-এশিয়ার রণাঙ্গনে ভারতীয়দের মুক্তি-আন্দোলনে ঐ সময়ে জাপান সরকারের সহযোগিতা সম্পর্কে এদেশে যেসব ভ্রান্ত ধারণা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কর্তৃক প্রচারিত হয়েছিল এবং তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবর্গদের মধ্যে অনেকেই ঐ অপপ্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয়দের মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্বকে লঘু করে দেখেছিলেন, রাসবিহারীর এই বক্তৃতার একাংশে তার একটি চমৎকার আলোচনা আছে। জাপানকে তাঁর মতো আর কেউ জানবার বা বুঝবার সুযোগ

পায় নি। সিঙ্গাপুর পতনের অব্যবহিতকাল পরে জাপান পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ভারতের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয়গণের প্রয়াসকে সমর্থন করে যা বলেছিলেন, রাসবিহারী তাঁর এই বক্তৃতায় তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ভারত সম্পর্কে তৎকালীন জাপ-সরকারের মনোভাব বুঝবার পক্ষে এই উদ্ধৃতিটিও মূল্যবান। এই বক্তৃতার সব শেষের কথা কয়টি ছিল এই : "Let us stand shoulder to shoulder and let us march hand in hand to success. Let us remember we have one indivisible nation, INDIA—one enemy, England,—one goal, complete Independence." একমাত্র সাভারকার ও সুভাষচন্দ্র ভিন্ন ভারতের আর কোনো নেতার কণ্ঠে আমরা এমন কথা শুনিনি।

এই ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নীতি নির্ধারক প্রস্তাবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রস্তাবের প্রথমেই আন্দোলনের 'মটো' বা মূলমন্ত্র হিসাবে তিনটি বাণী গৃহীত হয়, যথা—একতা, বিশ্বাস, বলিদান (Unity, Faith, Sacrifice); পৃথিবীতে কোনো আন্দোলনই এই তিনটি ব্যতীত সফল হয় না। রাসবিহারী তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। লীগের গঠন-তন্ত্রসূচক প্রস্তাবটির মধ্যেও যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। শুধু অভিনবত্ব নয়, রাজনৈতিক মুন্সিয়ানাও আছে। এগার সংখ্যক প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে : "Resolved that the formation, command, control and organisation of the Indian National Amy be in the hands of the Indian themselves." এর থেকেই বোঝা যায় যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা I. N. A. সর্বাংশে ভারতীয় ছিল ; কিন্তু সেদিন কংগ্রেস নেতাগণ ব্রিটিশ অপপ্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই বিষয়েও অনেক দিন যাবৎ ভ্রান্তধারণা পোষণ

করে ছিলেন। যে আন্দোলনের পুরোভাগে রাসবিহারী বসুর মতো একজন বিপ্লবী নেতা রয়েছেন সেখানে দেশের স্বার্থ যে অটুট থাকবে, এটা একমাত্র সাভারকার ও সুভাষচন্দ্র ভিন্ন আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেন নি। জাপ-সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেও তার বিনিময়ে তিনি ভারতের সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব (Absolute sovereignty) কখনো বিস্মৃত হন নি। বিপ্লবী রাসবিহারীর রাজনৈতিক প্রতিভার এইটাই তো বড়ো নিদর্শন।

প্রসঙ্গত একটি কথা মনে রাখা দরকার—ভারতীয় বাহিনী (I. N. A.) বা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের স্রষ্টার গৌরব রাসবিহারীর, সুভাষচন্দ্রের নয়। এ কথা নেতাজী স্বয়ং জানতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর বহু অনুরাগী ও অনুগামীদের হাতে ইতিহাসের সত্য রক্ষিত হয় নি। সত্য কথা বলতে, সমগ্র আন্দোলনের 'ব্লু প্রিণ্ট', ও বাহিনীর সংগঠন সুভাষচন্দ্র আসবার পূর্বে রাসবিহারীর নেতৃত্বে এই ব্যাঙ্কক সম্মেলনেই চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণ হয়েছিল। তবে একথা ঠিক যে, সুভাষচন্দ্রই একে তাঁর প্রতিভা অনুযায়ী নেতৃত্ব দিয়ে ঈপ্সিত সার্থকতার পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে শাহনওয়াজ খান তাঁর *Memories of I. N. A,* শীর্ষক গ্রন্থে সামান্য কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আয়ার তাঁর গ্রন্থে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অন্যান্য গ্রন্থে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠনের সব কৃতিত্ব একমাত্র নেতাজীকে দেওয়া হয়েছে। ইহা সত্যের অপলাপ ভিন্ন আর কিছু নয়। বরং প্রকৃত সত্য এই যে, রাসবিহারী শুধু লীগ বা আই. এন. এ. সৃষ্টি করেন নি, এক হিসাবে 'নেতাজী'ও তাঁরই সৃষ্টি, কারণ যেজন্য সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী'রূপে ফুটে উঠতে পেরেছিলেন তার পথ তো রাসবিহারীই সুগম করে দিয়েছিলেন। শুধু সুগম করে দেওয়া? তারো বেশি তিনি করেছিলেন।

এই স্মরণীয় ব্যাঙ্কক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন দেবনাথ দাস। সম্মেলনের একটি ফটোগ্রাফে দেখা যায় যে

মঞ্চের পিছনের দেয়ালে মাল্যশোভিত মহাত্মা গান্ধীর একখানি ছবি বিলম্বিত ছিল। দেবনাথ দাস তাঁর ভাষণে রাসবিহারী বসুকে "The pioneer of our movement for freedom in East Asia."—এই বলে অভিহিত করেছিলেন। এ গৌরব তাঁর সর্বাংশেই প্রাপ্য ছিল। সম্মেলনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে জাপান, মাঞ্চুরিয়া, হংকং, ব্রহ্মদেশ, বোর্নিও, জাভা, শ্যাম, সাংহাই, ম্যানিলা, মালয় ও ইন্দো-চীন—এই এগারটি দেশ থেকে সর্বসমেত একশত সাতাশজন ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন এবং সবচেয়ে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি—ছাপ্পান্নজন—মালয় থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে বাঙালী ছিলেন সর্বশুদ্ধ দশজন, যথা—রাসবিহারী বসু, এস. এল. সেন, বি, ডি. গুপ্ত (জাপান), এন, কে. ব্যানার্জি, এস. কে. চক্রবর্তী (ব্রহ্মদেশ), ডাঃ ডি. কে. মজুমদার, এস. সি. গুহ, লেঃ কঃ এ. সি. চ্যাটার্জি, বি. কে. দাস (মালয়) ও দেবনাথ দাস (শ্যাম)। প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলা ছিলেন দুইজন, যথা—শ্রীমতী ললিতা মিশ্র ও শ্রীমতী লাজ এস. মেহতানী (শ্যাম)। প্রতিনিধিদের মধ্যে সামরিক ও অসামরিক উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিই ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন শ্যামদেশের (থাইল্যাণ্ড) তৎকালীন বৈদেশিক দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী।

পূর্ব-এশিয়ার একাধিক রাষ্ট্র থেকে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছাসূচক বহু বাণী প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু বার্লিন থেকে প্রেরিত সুভাষচন্দ্রের বাণীটিই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে যোগদান করার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। যোগদানে তাঁর অক্ষমতার কারণ দেখিয়ে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে এবং য়ুরোপস্থ আজাদ হিন্দ সংঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। এই বাণীর একস্থলে সুভাষচন্দ্র

বলেছিলেন : "গত আঠার মাসের মধ্যে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার ফলে আমার মনে এখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, এই যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয় সুনিশ্চিত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আমার আরো দৃঢ় বিশ্বাস, এই যুদ্ধ চলার মধ্যেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে এবং ভারতের স্বাধীনতা থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন বিশেষভাবেই অনুপ্রেরণা লাভ করবে।"

শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত এই স্মরণীয় সম্মেলন চলেছিল নয় দিন। সম্মেলনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, শিলাপাকর্ণ নামক রঙ্গমঞ্চটি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই রঙ্গমঞ্চের বিশাল প্রেক্ষাগারটি নয়দিনই জনসমাবেশে পরিপূর্ণ ছিল—কোথাও তিল-ধারণের স্থান ছিল না ; এমন কি মঞ্চের বাইরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণটিও জনতায় ভরে গিয়েছিল। সমগ্র ব্যাঙ্কক সেদিন যেন এই উপলক্ষ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয়দের এত বৃহৎ প্রতি-নিধিমূলক সম্মেলন এর আগে আর কখনো হয় নি। আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, যখন আমরা ১৯৪২ সনের সেই ১৫ই জুনের কথা স্মরণ করি তখন আমবা কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই না যে, ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের নানা পর্বের সঙ্গে এই ব্যাঙ্কক সম্মেলনটিও একই সূত্রে বাঁধা। পূর্ব-এশিয়ায় এত বড়ো প্রাণচাঞ্চল্য যিনি সেদিন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই রাসবিহারী বসুর রাজনৈতিক প্রতিভা আজো কি তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে অনাদৃত থাকবে ? ত্রিশ বছর আগের সেই বিপ্লবীকে ১৯৪২-এর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই একজন দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞরূপে। তাঁর সেদিনকার ভাষণের মধ্যে রাসবিহারীর এই রূপটাই যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সকলের কাছে।

এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ৩১ সংখ্যক প্রস্তাবটি ছিল

এই : "This Conference requests Sjt. Subhas Chandra Bose to be kind enough to come to East Asia, and appeals to the Imperial Government of Japan to use its good offices to obtain the necessary permission and conveniences from the Government of Germany to enable Sjt. Subhas Chandra Bose to reach East Asia safe." তেমনি সুভাষচন্দ্রকে বার্লিন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবার জন্য জাপ-সরকারকে অনুরোধ করে আর একটি প্রস্তাবও এই সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল। এই দুটি প্রস্তাবের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসবিহারীই সুভাষচন্দ্রকে আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই দুটি প্রস্তাবের অনুলিপি যথাসময়ে বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের নিকট প্রেরিত হয়েছিল।

তখন বার্লিনে জাপ্-দূতাবাসের এ্যাটাচি ছিলেন সিন হিগুতি। রাষ্ট্রদূত ছিলেন ওসিমা। কিভাবে সুভাষচন্দ্রকে বার্লিন থেকে টোকিও আনা হয় সেই সম্পর্কে হিগুতি যে বিবরণটি লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি পাঠ করে জানা যায় যে, ১৯৪১ সনের মার্চ মাসে বার্লিনে উপস্থিত হওয়ার ছয় মাস পরেই তিনি জাপ-দূতাবাসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন ও তাঁর বার্লিন আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। ঐ বছরের শেষভাগেই তিনি জাপ-রাষ্ট্রদূতকে তাঁর জাপান যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। জাপ-রাষ্ট্রদূত ওসিমা টোকিওতে যখন ঐ সংবাদ প্রেরণ করেন তখন তাঁর নিকট জাপ সামরিক বিভাগের সদর-দপ্তর থেকে তারযোগে এই বার্তাটি গিয়েছিল : "In Tokyo here is a big Indian revolutionary, Mr. Rash Behari Bose. Why to invite another from Berlin under these bad circumstances. ?" হিগুতি আরো লিখেছেন যে, সিঙ্গাপুর পতনের পর থেকে জাপানে আসবার জন্য সুভাষচন্দ্র বার্লিনস্থ জাপ-রাষ্ট্রদূতকে

প্রবলভাবে অনুরোধ করতে থাকেন। প্রতি সপ্তাহেই একবার করে তিনি ঐ দূতাবাসে যেতেন। সেই সময়ে রাসবিহারী সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে হিগুতির অনেক আলোচনা হয় এবং তখন সুভাষচন্দ্র তাঁকে এই কথাটি বলেছিলেন : "I shall be happy if I can fight as a soldier under Mr. Rash Behari Bose, as it is good for the independence of India." এই উক্তি নিঃসন্দেহে সুভাষচন্দ্রের যোগ্য উক্তি। পরবর্তী কাহিনী সুপরিচিত এবং আমি অন্যত্র তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ তথা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সুপরিচালনার জন্য সেদিন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। যদিও রাসবিহারী বসু ত্রিশ বৎসরকাল জাপানে বাস করেছেন তথাপি ভারতে তাঁর নাম ততবেশি পরিচিত ছিল না, যতখানি পরিচিত ছিল সুভাষচন্দ্রের নাম। এ ছাড়া, বয়সের ভারে তাঁর শারীরিক স্বাস্থ্যেরও তখন অনেকখানি অবনতি ঘটেছিল। যাঁর শরীরের ওজন ছিল প্রায় দুশো পাউণ্ড, তখন তা হ্রাস পেয়ে একশো পাউণ্ডের অল্প কিছু বেশিতে এসে দাঁড়িয়েছে। জাপানী সামরিক বিভাগের সদর-দপ্তরের কর্তৃপক্ষ তাই সুভাষচন্দ্রকেই লীগ ও ফৌজের নেতৃত্ব দিতে মনস্থ করলেন— কারণ ভারতে তাঁর জনপ্রিয়তা রাসবিহারীর জনপ্রিয়তা অপেক্ষা অধিক ছিল। টোকিওতে উপস্থিত হওয়ার পর প্রধান মন্ত্রী তোজো ও সামরিক বিভাগের অন্যান্যদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যখন প্রথম বৈঠক বসেছিল তখন এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। কর্ণেল ইয়াকুরো মারফৎ সিঙ্গাপুরে যখন সামরিক বিভাগের সদর-দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত রাসবিহারী বসুর নিকট জ্ঞাপন করা হয় তখন সুভাষচন্দ্রের মনে এই আশঙ্কা ছিল যে হয়ত রাসবিহারী এজন্য মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।

কিন্তু তাঁর সে আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক ছিল। রাসবিহারী বিপ্লবী ; বিপ্লবীর কাছে ব্যক্তিগত মর্যাদা গৌণ, স্বদেশের স্বাধীনতাই মুখ্য।

তাই দেখা যায় যে, কর্ণেল ইয়াকুরো যখন তাঁকে সদর দপ্তরের সিদ্ধান্ত জানালেন তখন রাসবিহারী বললেন—"খুব ভালো কথা যদি সুভাষচন্দ্র আসেন। এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। আমি সানন্দে তাঁকে নেতৃত্ব অর্পণ করব। আমাদের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা। আমার কাজ এখন শেষ হয়েছে। আমি তরুণ সুভাষচন্দ্রের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করব।" এই উক্তির মধ্যে রাসবিহারীর বিপ্লবী চরিত্রের যে মহত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন supreme self-dedication-এর দৃষ্টান্ত আমরা আর দুটি পাই না।

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। অমানুষিক পরিশ্রম করে রাসবিহারী গড়ে তুলেছিলেন স্বাধীনতা সংঘ ও জাতীয় বাহিনী। এই সময়ে ক্যাপ্টেন মোহন সিং তাঁর বিরুদ্ধে এক হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে মূল সংঘ থেকে সৈন্যবাহিনী ভাঙিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পান। যেহেতু সংঘ-সভাপতি একজন জাপানী নাগরিক, সেইহেতু তাঁর নেতৃত্ব ও জাপানের প্রতিশ্রুতির সততায় মোহন সিংহের মনে সন্দেহ জাগল যে ইনি বুঝি জাপানের স্বার্থেই সব করছেন। রাসবিহারী যখন এই চক্রান্তের সংবাদ জানতে পারলেন, তখন তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। অন্য কেউ হলে এই মানসিক আঘাত সহ্য করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত ছিল এই বিপ্লবীর চরিত্র। ১৯৪১ সনের ৯ই ডিসেম্বর একটি প্রকাশ্য ঘোষণা মারফৎ তিনি লীগ ও বাহিনীর সম্পূর্ণ নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন আর বিশ্বাসঘাতক মোহন সিং এবং গিলানীকে করলেন পদচ্যুত; প্রথম জনকে রাখলেন সতর্ক পাহাড়ার মধ্যে আর দ্বিতীয়জনকে করলেন কারারুদ্ধ। মেননকেও পদচ্যুত করলেন। মোহন সিং-এর স্থলে তিনি বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পণ করেন মেজর-জেনারেল

ভোঁসলের উপর। একটা বিশৃঙ্খলা যে এই সময়ে সংঘ ও বাহিনীর মধ্যে দেখা দিয়েছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্বার্থান্বেষীরা তারই সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। তখনি তিনি বুঝলেন যে, এইবার একজন যোগ্য নেতার প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র ভিন্ন তেমন নেতা আর কে আছেন? —এই চিন্তা যে সেই সময়ে তাঁর মনে উদয় হয়েছিল, তা বলা বাহুল্য। তাই আমরা দেখতে পাই যে, কর্ণেল ইয়াকুরো যখন তাঁর কাছে উপরি উক্ত প্রস্তাব করেন তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পেরেছিলেন: "I will cede my chair to him with the greatest pleasure. Let Mr. Subhas Chandra Bose take the baton." রাসবিহারীর এই মহত্ব নেতাজী স্বয়ং স্বীকার করেছেন। তাই আমাদের দুঃখ হয় এই ভেবে যে, নেতাজী-প্রসঙ্গে তাঁর অনুরাগী ও অনুগামীরা এমন একটি মহাপ্রাণ বিপ্লবীর কথা অনুরাগের সঙ্গে উল্লেখ করতে চান না। ইতিহাসের বিচারে কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাসবিহারীর দান ও তাঁর আত্মত্যাগ উপেক্ষিত হয় নি।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩।

ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ঐদিন রাসবিহারী স্বহস্তে জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন তরুণ সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে, বরণ করলেন তাঁকে নেতৃত্বে আর তুলে দিলেন তাঁর হাতে ভারতমুক্তির মশাল—যে মশাল তিনি স্বহস্তে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। তখন রাসবিহারীর বয়স সাতান্ন, সুভাষচন্দ্রের বয়স ছেচল্লিশ। ঐদিন সিঙ্গাপুরের সিটি হলের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সমবেত এক বিশাল ভারতীয় জনতার সম্মুখে সুভাষচন্দ্রকে তাদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়ে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে রাসবিহারী বলেছিলেন: "বন্ধুগণ, আপনারা

আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য টোকিওতে আমি কি করেছি এবং আপনাদের জন্য আমি কি উপঢৌকন নিয়ে এসেছি। আমি আপনাদের জন্য আজ এই উপঢৌকনটি (অঙ্গুলি সংকেতে সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়ে) নিয়ে এসেছি। এঁর পরিচয়, কি ভারতে, কি ভারতের বাইরে, নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় তারুণ্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মহত্তম, যা কিছু দুঃসাহসিকতাপূর্ণ, যা কিছু বেগবান, সুভাষচন্দ্র তারই প্রতিমূর্তি। তিনিই বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। বন্ধুগণ, আজ আপনাদের সম্মুখে আমি পদত্যাগ করছি এবং পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতিপদে তাঁকে সসম্মানে বরণ করছি।"

সিঙ্গাপুরের উজ্জ্বল আকাশের তলায় অমনি সমবেত জনতার কণ্ঠে উঠল রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্রের জয়ধ্বনি। তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল এশিয়ার দিকে দিকে।

এই দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সুভাষচন্দ্র একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি রাসবিহারীর প্রতি যে ভাষায় তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। বিপ্লবী ভিন্ন বিপ্লবীজীবনের মাহাত্ম্য কেই বা উপলব্ধি করতে পারেন? সেই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেছিলেনঃ "His marvellous achievements at the risk of his life during the last War for liberation of India are not only fresh in our memories but are also in the records of the Birtish Imperialism." সুভাষচন্দ্রের সেদিনের বক্তৃতাটি তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ে প্রদত্ত অন্যান্য বহু বক্তৃতার মধ্যে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। সেদিনের সভার কার্য আরম্ভ হয়েছিল 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দিয়ে। গান গেয়েছিলেন কুমারী সরস্বতী। জাতীয় সঙ্গীত ব্যতীত 'জয়তু সুভাষ' নামে একটি নূতন গানও গাওয়া হয়েছিল।

রাসবিহারী পদত্যাগ করলেন বটে কিন্তু তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে দেওয়া হলো না। লীগের নব-নিযুক্ত সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র তাঁকে আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বোচ্চ পরামর্শদাতারূপে নির্বাচিত করেন। অতঃপর আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে ও আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্র প্রধানরূপে সুভাষচন্দ্র যে গৌরবপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে কাহিনী একান্তভাবেই নেতাজীর জীবনের কাহিনী, রাসবিহারীর জীবনের নয় এবং সে কাহিনী আমি আমার 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এই-ভাবেই সেদিন ইতিহাসের বিচিত্র গতিপথে ভারত থেকে বহুদূরে, এক উত্তাল ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এই দুই মহান বিপ্লবীর মিলন হয়েছিল। ভবিষ্যতের কোনো কবি একদিন সেই মিলনের কাব্য রচনা করবেন।

যেদিন তিনি এইভাবে সংঘ ও বাহিনীর নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেদিনের কথা আজ যখন আমরা স্মরণ করি তখন রাসবিহারী চরিত্রের এই মহত্ত্ব আমাদের অভিভূত করে। রাজনীতিতে নেতৃত্বের অভিমান বা মোহ ত্যাগ করা বড়ো কঠিন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে কিনা জানি না, তবে ভারত-ইতিহাসে এই জিনিস আমরা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। নেতাজীর অন্যতম জীবনীকার আয়ার সম্ভবত এই কথাটা মনে করেই তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি করে থাকবেন: "The exquisite grace with which Rash Behari Bose handed over the leadership of the historic movement to Subhas Chandra Bose will remain one of the unforgettable chapters in the history of India's struggle for freedom." অবিস্মরণীই বটে। অবিস্মরণীয় এবং চিরস্মরণীয়। অতুলনীয় এই আত্মত্যাগ সমগ্র রাসবিহারী-চরিত্রকে চিরকালের মতো এক নূতন মহিমায় মণ্ডিত করে দিয়েছে। 'আত্মসমর্পণ' কথাটি যে এই বিপ্লবীর

কাছে একটি পবিত্র creed ও faith-স্বরূপ ছিল, তা তাঁর এই নেতৃত্ব-ত্যাগের ভিতর দিয়েই সেদিন অভিব্যক্ত হয়েছিল।

রাসবিহারীর জীবনের কাহিনী শেষ করার পূর্বে তাঁর সম্পর্কে আরো দু'একটি কথা বলার আছে। আমরা দেখেছি, ১৯১৫ সনে ভারত ত্যাগের পর ভারতের রাজনীতিতে যেদিন গান্ধীর অভ্যুদয় ঘটল সেদিন থেকে স্বদেশের মুক্তিআন্দোলনের গতি-প্রকৃতি তিনি গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ করতেন। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক সংবাদ তিনি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। ১৯১৯ সনের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের, অমৃতসরে, জালিয়ানওলাবাগে অনুষ্ঠিত সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এবং ও'ডায়ারী শাসনের নগ্ন নিষ্ঠুরতার সংবাদে তিনি যারপর নাই বিচলিত বোধ করেছিলেন। নির্বাসিত সিংহের কণ্ঠে তখন আমরা এই উপলক্ষ্যে যে নিষ্ফল গর্জন শুনতে পাই তা আজো আমাদের শরীরে রোমাঞ্চ জাগায়। অসহযোগ আন্দোলনের দিনে ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে তিনি কি ভাবে জাপানের সংবাদ-পত্রগুলি মারফৎ ঐদেশের জনমত গঠন করেছিলেন তার পরিচয় আছে ঐ সময়ে প্রবর্তক সংঘ থেকে প্রকাশিত *The Standard Bearer* নামক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার স্তম্ভে। তারপর যখন ইতিহাস-বিখ্যাত আগস্ট আন্দোলনের প্রাক্কালে গান্ধীপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী দ্বারা ঐ আন্দোলনে যোগদানকারী ভারতীয়রা অকথ্য নির্যাতন ভোগ করতে থাকে, তখন ৯ই ও ১৪ই আগস্ট, ১৯৪২ তারিখে থাইল্যাণ্ড রেডিও থেকে ভারতীয়দের উদ্দেশে তিনি যে দুটি বেতারভাষণ দিয়েছিলেন তা ব্যাঙ্কক সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের তুল্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৯৪৫, ২১শে মে

টোকিওতে স্বীয় বাসভবনে গভীর রাত্রিতে রাসবিহারী বসুর মৃত্যু হলো।

স্বদেশের মুক্তি চিন্তা করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রণক্লান্ত যোদ্ধা আজ মৃত্যুর কোলে শান্ত হলেন।

ঐ বছরের গোড়াতেই তিনি অসুস্থ হন। চিকিৎসার সকল রকম ব্যবস্থাই হয়েছিল, কিন্তু জীবনের শেষ পাঁচ বৎসরকাল তাঁকে যে রকম অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল, লীগের সংগঠনে যেভাবে মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়েছিল, তার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। সেই বিশাল দেহ কর্মভারে জীর্ণ হয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটপরিবর্তন হয়েছে; জাপানের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাসবিহারী এই সংবাদ অবগত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে জাপ-সম্রাট এই স্বদেশপ্রেমিককে জাপানের সর্বোচ্চ সম্মান, 'Second Order of the Merit of the Rising Sun' পদক প্রদান করেছিলেন। এমন কি তাঁর মৃত্যুসংবাদ রাজকীয় ঘোষণায় প্রচারিত হয়েছিল এবং পরের দিন সম্রাটের প্রাসাদ থেকে সুসজ্জিত রাজকীয় শবাধার প্রেরিত হয়েছিল। ঐ শবাধারেই তাঁর নশ্বর দেহ যোজুজী মন্দিরে শেষকৃত্যের জন্য বহন করে আনা হয়েছিল।

টোকিওতে রাসবিহারীর মৃত্যু-সংবাদ যখন নেতাজীর কাছে পৌঁছল, তখন আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানরূপে তিনি আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বোচ্চ পরামর্শদাতার স্মৃতির প্রতি নিবেদন করলেন আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মধ্যেই অভিব্যক্ত হয়েছে এই মহান্ বিপ্লবী নায়কের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। সুভাষচন্দ্রের কোনো জীবনী-কার কেন যে তাঁদের গ্রন্থে এটির উল্লেখ করেন না, তা অনুমান করা কঠিন। আমরা এইখানে তাই সুভাষচন্দ্র-প্রদত্ত এই শ্রদ্ধাঞ্জলিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিলাম:

"রাসবিহারী বসুর বেদনাদায়ক মৃত্যু আমার পক্ষেও ব্যক্তিগত ক্ষতি, আমার সহকর্মীদের ও ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে তো বটেই! পরলোকগত রাসবিহারী বসু শুধু একজন জন্মবিপ্লবী ছিলেন না, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষও ছিলেন। আমার যৌবনকালে তাঁহার জীবনের দুঃসাহসিক কার্যাবলীর বিবরণ যখন শুনিতাম, তখন আমি রোমাঞ্চ বোধ করিতাম। ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী তাঁহার সেই বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস আজ ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। আজ ত্রিশ বছর পরে আমি যখন তাহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তখন তাঁহার ব্যক্তিগত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অপরিসীম আশাবাদ আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার বয়স অথবা স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি কিছুই তাঁহার সংগ্রামী মনোভাবকে পরাস্ত বা নিরস্ত করিতে পারে নাই।

"প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি জাপানে আসিয়া যে রকম কঠিন পরিশ্রম করিয়াছিলেন সেজন্য রাসবিহারী বসুর প্রতি ভারতের কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইহা আমাদের স্মরণ থাকিতে পারে যখন রবীন্দ্রনাথ জাপান পরিদর্শনের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি অকুণ্ঠতার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য রাসবিহারী বসুর নিঃস্বার্থ ত্যাগের কথা বলিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। জাপানে অবস্থানকালে তিনি ভারতের জন্য যেভাবে ঐ দেশের বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা ও সদিচ্ছার পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তীকালে যখন বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ায় যুদ্ধ বাধিয়াছিল তখন উহা ফলপ্রসূ হইয়াছিল এবং জাপানের জনসাধারণ ও জাপ-সরকার ভারতের সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

"পরলোকগত রাসবিহারী বসুকে যথার্থই পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয়

স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক বলা যাইতে পারে। বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ায় যুদ্ধ বাধিবার পর হইতেই এই আন্দোলন সমধিক গুরুত্ব লাভ করে। ইহা আদৌ অত্যুক্তি নয় যে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্যই বাঁচিয়াছিলেন এবং ইহারই জন্য প্রাণ দিয়াছেন। মাতৃভূমির জন্য তাঁহার বহুবিধ কার্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল ব্যাঙ্কক সম্মিলনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ ও সমগ্র পূর্ব-এশিয়াতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ) স্থাপন করা ; ব্যাঙ্ককে ইহার সদর-দপ্তর ছিল।

"রাসবিহারী বসু আজ লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সদাজাগ্রত থাকিবে তাঁহার সেই অদম্য মনোভাব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বশেষ ইংরাজ ভারত হইতে বিতাড়িত হইতেছে এবং ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতেছে—যাহা তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল, ততক্ষণ তাহার সেই অজেয় মনোভাব আমাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণা দিতে থাকিবে।"

২৫শে জানুয়ারি টৌকিওতে যেদিন তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় (যদিও রাসবিহারী স্বয়ং তাঁর উইলে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তার মৃত্যুর পরে তার দেহ ভস্মীভূত না করে, তার মস্তকটি যেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য দেওয়া হয়, তথাপি তাঁর কন্যার ইচ্ছানুসারে ঐ নির্দেশ রক্ষিত হয় নি।) সেদিন নেতাজী সমগ্র পূর্ব-এশিয়াতে লীগের বিভিন্ন শাখায় ২৯শে জানুয়ারি লীগ-প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসুর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য সভা করবার নির্দেশ দান করেছিলেন। ঐদিনই তাঁর সভাপতিত্বে আজাদ হিন্দ সরকারের সদর-দপ্তরে মন্ত্রী-পরিষদ ও পরামর্শদাতাগণের একটি বিশেষ সভা হয়েছিল। পরিষদে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল :

"আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী-পরিষদ ও পরামর্শদাতাদের এই সভা গভীর দুঃখের সহিত 'শ্রীরাসবিহারী বসুর মৃত্যুতে শোক

প্রকাশ করিতেছে। স্বাধীনতার জন্য তাঁহার জীবনব্যাপী নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও কর্মপ্রয়াস ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার আরব্ধ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চালাইয়া যাইবার জন্য এই সভা প্রতিজ্ঞা করিতেছে—এইরূপেই তাহার জীবনসাধনা চরিতার্থতা লাভ করিবে।”

কেবল মাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করেই রাসবিহারী সম্পর্কে নেতাজী তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। এই মহান্ বিপ্লবীকে আরো অন্যভাবে সম্মানিত করার কথা তিনি চিন্তা করলেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশে পরিষদ ‘তমঘা-ই-আজাদ’ (Tamghe-E-Azad) এই নামে একটি নূতন সামরিক সম্মান (Order) প্রবর্তন করেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য রাসবিহারীর অপূর্ব ত্যাগের কথা স্মরণ করে তাকেই সর্বপ্রথম এই সম্মান দ্বারা ভূষিত করা হয়। পরিষদ ‘রাসবিহারী বসু পদক’ নামে একটি পদক দেওয়ার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন এবং টোকিওর সামরিক আকাদেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও কৃতকার্য ভারতীয় ক্যাডেটকে এই পদক দেওয়া হবে বলা হয়।

এইভাবেই সেদিন বিদেশে প্রকৃত স্বাধীনতাকামী ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই শ্রেষ্ঠ সৈনিককে সম্মানিত করা হয়েছিল আর তা করা হয়েছিল তাঁরই সমকালীন আর একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিকের নির্দেশে। কিন্তু তাঁর মাতৃভূমির বেদীতলে আত্মসমর্পিত-প্রাণ এই বিপ্লবী মহানায়কের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর স্বদেশ-বাসী আজ পর্যন্ত কতটুকু করেছেন ?

এই প্রশ্নটি আজকের বাঙালী সন্তানদের সামনে আমি রাখলাম। “So great was Rash Behari that his height still remains unmeasured.” রাসবিহারী সম্পর্কে বিখ্যাত বিপ্লবী, ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আপন

মহত্ত্বে উদাসীন, আপন অস্তিত্বে ভ্রূক্ষেপহীন আত্মপ্রত্যয়ের মূর্তবিগ্রহ, জাতীয়তার পতাকাবাহী, রাসবিহারী বসুর বহুভঙ্গিম জীবনের প্রতি আজ যখন আমরা সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমাদের মনে আর একটি প্রশ্ন জাগে। আজ যতীন্দ্রনাথ নেই,রাসবিহারী নেই, সুভাষচন্দ্র নেই—তাঁদের উত্তরাধিকার কে বহন করবে? একদিন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যাঁর উদ্যত বাহু আমরা দেখেছি, যাঁর কর্ম ও চিন্তার মধ্যে পেয়েছি অপরিমেয় দুঃসাহসের পরিচয়, পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সংকল্পে যিনি ছিলেন মৃত্যুভয়হীন, যিনি ছিলেন সামরিক শক্তি ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী, যাঁর বলিষ্ঠ হস্তধৃত আগ্নেয়াস্ত্র মুখে সর্বদা ঝঙ্কৃত হতো স্বাধীনতার দীপক রাগিণী, সেই বিপ্লবী মহানায়ককে প্রণাম করি আর বলি, "তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ করো।"

সবশেষে আমার বলার কথা এই যে, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য যে দুর্জয় ও দুর্নিবার সংকল্প-নিষ্ঠা নিয়ে এই শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশের যুবশক্তি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, সেই বৈপ্লবিক সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ ছিলেন রাসবিহারী বসু। কাহিনী ও কিম্বদন্তীতে মিলিয়ে তাঁর নাম একদিন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মুখে মুখে ফিরত—ভারতের সর্বত্র ছিল তাঁর নিঃশঙ্ক পদক্ষেপ। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব অবসানের কঠিন পরিকল্পনা রচনায় সর্বদা অস্থির ছিল তাঁর মস্তিষ্ক। তাঁরই বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার ফলে ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই একটি মানুষ সেদিন ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রৌলট রিপোর্টের সেই লাইনটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য: "Among the few handful of Bengal revolutionaries who made the British Government almost impossible in India, the name of Rash Behari Basu tops

the list." এই উক্তি থেকেই প্রতীয়মান হবে যে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসের সেই স্বর্ণ অধ্যায়টি রাসবিহারীর জীবনের সঙ্গে যেমনভাবে একই বৃন্তে গ্রথিত হয়ে আছে, এমন বোধ হয় আর কারো জীবনের সঙ্গে নয়।

গান্ধীযুগের পেশাদারী রাজনীতির আসরে আমরা অনেককে দেখেছি, কিন্তু নিখাদ দেশপ্রেমের এমন ভাস্বর ও উন্নতশির মূর্তি আমাদের দৃষ্টিপথে খুব বেশি পড়ে না। আজ যাঁরা স্বাধীনতার সৌধে আরোহণ করেছেন সেই সৌধের ভিত্তি ও সোপান রচনায় কি নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা ও আত্মত্যাগের মূল্য দিতে হয়েছে, রাসবিহারী বসুর জীবন তারই অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করছে। এই জীবনের সঞ্জীবন স্পর্শেরই আজ বিশেষ প্রয়োজন।

॥ গ্রন্থ-নির্দেশিকা ॥

এই গ্রন্থরচনায় যেসব পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি, সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকখানির নাম এখানে উল্লিখিত হলো।

১। *Rash Behari Basu: His Struggle for India's Independence*—Ed. by Radha Nath Rath & Sabitri Prasanna Chatterjee; ২। *The Roll of Honour*—Kali Charan Ghosh; ৩। *Unto Him a Witness*—S. A. Ayer; ৪। *The Two Great Indians in Japan*—J. G. Ohsawa; ৫। *Memoirs*—M. N. Roy; ৬। *Savarkar and His Times*—Dhananjay Keer; ৭। *India as I Knew it*—Sir Michael O'Dyer; ৮। *Sedition Committee Report*; ৯। *Revolutionaries of Bengal*—Hemanta Kumar Sarker; ১০। *Our Struggle and Rash Behari Bose*—Matilal Roy; ১১। *My Indian Years: 1910-1916*—Lord Hardinge; ১২। **ধর্ম ও জাতীয়তা**—শ্রীঅরবিন্দ; ১৩। **বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি**—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়; ১৪। **অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস**—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত; ১৫। **নবযুগের বাংলা**—বিপিনচন্দ্র পাল; ১৬। **স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা**—নরহরি কবিরাজ; ১৭। **মানবেন্দ্রনাথ: জীবন ও দর্শন**—স্বদেশরঞ্জন দাস; ১৮। **আত্মকথা**—পুলিন দাস; ১৯। **বন্দী-জীবন**—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।

॥ একটি জ্বলন্ত তরবারীর জীবন-কথা ॥

বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীকার

মণি বাগচি প্রণীত

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র

সর্বজনপ্রশংসিত এই সুভাষ-জীবনী সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ঃ

"লব্ধ-প্রতিষ্ঠ জীবনীকার শ্রীমণি বাগচি প্রণীত 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র' শুধু তাঁর জীবন-কথা নয়, পরন্তু তাঁর জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার সুষ্ঠু বিশ্লেষণের পরিচয় আছে এর প্রতিটি পৃষ্ঠায়।"

—চারুচন্দ্র সান্যাল (যুগান্তর)

"এই বীর বিপ্লবীর জীবন-কথা আজ ইতিহাস হয়ে উঠেছে। তাঁরই বীরব্রত উদ্‌যাপনের কাহিনী রচনা করেছেন প্রখ্যাত জীবনীকার শ্রীমণি বাগচি।...গ্রন্থখানির প্রধান বিশেষত্ব তার সহজ সুন্দর এবং সাবলীন প্রকাশভঙ্গিমা। কিশোর বালক হতে আরম্ভ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়ক নেতাজী সুভাষের সমস্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে রয়েছে।"

—নমিতা চক্রবর্তী (চিত্রাঙ্গদা)

"শ্রীমণি বাগচি কর্তৃক এই সুভাষ-জীবনী সুভাষ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে। শ্রীবাগচির আলোচনা যেমন মূল্যবান, তেমনি চিত্তাকর্ষক।... দেশ-মানসে নেতাজীর যে ভাবমূর্তি বিরাজ করছে, লেখক এই গ্রন্থে তা প্রতিফলিত করতে পেরেছেন।"

—অধ্যাপক অশোক মুস্তাফি (রাষ্ট্র)

"তেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই জীবনী-গ্রন্থটিতে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে প্রায় সকল বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। প্রতিটি ঘটনা ও প্রতিটি বৃত্তান্তকে লেখক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সে যুগের পটভূমিকায় দেখবার চেষ্টা করেছেন। ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর জীবনী-গ্রন্থ।"

—অধ্যাপক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (লোকভারতী)

॥ দাম চার টাকা ॥